সাধক রুইদাস

ভবেশ দত্ত

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীসুরেশ দাশ
৩৭/১১১,বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
শুভ ১লা বৈশাখ-১৯৫৮

প্রচ্ছদ শিল্পী :
প্রেম ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর :
যশোদা মাইতি
৩৮,শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

ছবি, বুলু, চিনু, আনু, পুতুল ও

বাপীকে—

বাবা

অন্যান্য ধর্মপুস্তক :

তারাপীঠের সাধক

শক্তিপীঠের সাধক

প্রভু নিত্যানন্দ

সাধক তুলসীদাস

সাধক হরিদাস

সাধক রুইদাস
সাধক রুইদাস
সাধক রুইদাস
সাধক রুইদাস
সাধক রুইদাস
সাধক রুইদাস
সাধক রুইদাস
সাধক রুইদাস

SADHAK RUHI DAS

BY

BHABESH DUTTA

ভূমিকা

জ্ঞানতাপস ও সাধক রুইদাসের কথা সবাইকে জানাই এমন শক্তি আমার নেই। যেটুকু তাঁর কথা বলেছি সে সবই তাঁর কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে। অন্তরালে বসে সবার অলক্ষ্যে হয়তো তিনি আমাকে লেখার মালমশলা যুগিয়েছেন আর আমি শুধু রাজমিস্ত্রীর মত সেই মশলা দিয়ে ভাষা ও ভাবের ইট সাজিয়ে এই ভক্তিসৌধ রচনা করেছি। যাঁর কাজ তিনিই করিয়েছেন, আমি শুধু নির্দেশ পালন করেছি।

সাধক রুইদাস ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক আকাশে এক উজ্জল নক্ষত্র। যে নক্ষত্রের আলোয় অকূল সংসার-সমুদ্রে উত্তর যুগের মানুষ তাদের যাত্রাপথের নিশানা ঠিক করে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাঁদেরই প্রেরণায় ও আশীর্বাদে নিজেদের দুর্লভ মনুষ্যজন্ম সার্থক করবার প্রয়াসী হন। আমাদের মত সাধারণ মানুষের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রেরণায় সত্যবস্তু উপলব্ধি করবার জন্য যে প্রাণপাত সাধনা করে তিনি সিদ্ধ হয়ে পরবর্তীকালের মানুষদের আনন্দের উৎসের সন্ধান দিয়ে গেলেন। এতদ শত্বেও তাঁর অহেতুক কৃপা ভিন্ন আমার মত একজন কৃমিকীটের জীবন সার্থক হবেনা তাই যাঁর কৃপায়। যাঁর আশীর্বাদে আমি লেখনী ধারণ করেছি একমাত্র তিনিই বলতে পারেন যে এই লেখার সার্থকতা কি! জীবনের সায়াহ্নে উপস্থিত হয়ে এখন আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি যে, যে সুখশান্তির লালসায়ের জাগতিক ভোগ্যবস্তুর মধ্যে ডুব দিয়েছিলাম তা যে কতবড় ভুল তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি। তাই আমার মত একজন বিপথগামী ভুক্তভোগীর অনুরোধ বিশেষতঃ যুব সমাজের কাছে তারা যেন মুনিঋষিদের পূত পাদস্পর্শে ধন্য এই ভারতবর্ষের মূল যে সত্যানুসন্ধান বৃত্তি তা যেন তারা অনুসরণ ও অনুশীলন করে ভারতবাসির তথা নিজেদের জীবন সার্থক করেন।

সাধক রুইদাসের কথা লিখতে গিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে কাঁচরাপাড়া শিখ গুরুদ্বারের পুজারী সর্দার গুরুমুখ সিং-এর কাছে। তিনি আমাকে শিখ ধর্মগ্রন্থ "গ্রন্থসাহেব" থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। ভোলানাথ প্রকাশনীর কর্ণধার ভক্তপ্রবর আমার পরম স্নেহভাজন সুরেশ দাশ অন্তরের সমস্ত ভক্তি উজাড় করে দিয়ে এই বই প্রকাশ করেছেন সেজন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। তাঁর ও তাঁর প্রকাশনীর মঙ্গল হোক এই কামনা করি। সাধক রুইদাসের কথা লেখার প্রেরণা প্রথমেই আমি পেয়েছি শ্রীগৌরীশঙ্করদার কাছে থেকে। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পাঠক পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন ভুল ত্রুটি চোখে পড়লে আমাকে তা সংশোধনে সহায়তা করেন।

ভবেশ দত্ত

কামার পাড়া
রানাঘাট
নদীয়া

সাধক রুইদাস

॥ এক ॥

"রামায় রামচন্দ্রায়, রামভদ্রায় বেধসে
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।"

রামানন্দ স্বামী মন্দিরের ভিতরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভোগ নিবেদন করছেন আর মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছেন জয় রাম, জয় রাম। জয় সীতাপতি রঘুনাথ।

মন্দিরের দরজা জানালা বন্ধ। মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেল তবুও তিনি দরজা খুলছেন না। কেন এত বিলম্ব হচ্ছে তা কেউ জানে না। সকলে একদৃষ্টে মন্দিরের দরজার দিকে চেয়ে আছে। গুরুদেব ভোগ নিবেদন করে বেরিয়ে আসলে তবে আশ্রমের সবাই প্রসাদ পাবে।

কত বেলা হয়ে গেল। সমস্ত আশ্রমবাসীরা উপবাসী। এমন তো কোনদিন হয়না! নিত্য তিনি মন্দিরে ভোগনিবেদন করে বেরিয়ে আসেন কিন্তু এত সময় তো লাগে না!

কি হল আজ গুরুদেবের! আজ এত বিলম্ব কেন!

সকালে বেশ দুর্যোগ ছিল। ঝড় বৃষ্টিতে সবাইকে বেশ বিব্রত হতে হয়েছে।

আকাশ এখন পরিষ্কার। কোথাও মেঘের এতটুকু চিহ্ন নেই। রোদ্দুরে ভরে গেছে সারা আশ্রম। আশ্রম প্রাঙ্গনের মাঝে বাতাবী লেবুর গাছের পাতা বেয়ে দুই এক ফোঁটা জল পড়ছে। খাঁচার

পাখীগুলো ছট্‌ফট করছে। তারাও প্রসাদ না খেয়ে অন্য কিছু আহার করে না।

মন্দিরের সামনে শিষ্যরা বসে আছে হাতজোড় করে। হে রঘুনাথ! কৃপা কর। জীবনের মধ্যাহ্ন শেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যা আসছে। এখনও কি তোমার কৃপা করার সময় হল না। তোমাকে দেবার তো কিছুই আমাদের নেই—যে ভক্তি আর প্রেম এতদিনে সঞ্চয় করেছি তুমি দয়া করে তাই গ্রহণ করে আমাদের কৃতকৃতার্থ কর।

মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেল।

আশ্রম প্রাঙ্গন থেকে সূর্য্যদেবের কৃপারশ্মি সরে গেল। রামানন্দ স্বামী মন্দিরের দরজা খুলে বাইরে এলেন শূন্য হাতে। তাঁর দুই চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে চলছে অবিরাম। সারা মুখে বিস্ময়ের কালিমা মাখা।

চমকে উঠল আশ্রমবাসীরা। কেউ কেউ হাতজোড় করে কাঁপছেন। একি হোল। গুরুদেবের চোখে জল কেন? তবে কি তিনি এতক্ষণ ঠাকুর রামচন্দ্রের চরণ ধুইয়ে দিচ্ছিলেন?

শিষ্য কৃষ্ণদাস বলে উঠলেন। গুরুদেব এ ভাবান্তর তো আমরা কোনদিন দেখিনি—শূন্য হাতে এলেন, চোখে জল, প্রসাদ কই! আমরা যে সকাল থেকেই উপবাসী।

রামানন্দ স্বামী চোখের জল মুছে বললেন, আর তোমরা কেউ কোনদিন প্রসাদ পাবে না। এবার থেকে উপবাস আর অনাহারেই তোমাদের কাটাতে হবে। ঠাকুর আজ ভোগ গ্রহণ করেন নি। আর কোনদিন ভোগ নেবেন কিনা তা আমি জানি না। তোমাদের সকলের পক্ষে আশ্রম ত্যাগ করাই হবে যুক্তিযুক্ত কাজ।

—কিন্তু আমরা যাবো কোথায়? আপনার চরণ আশ্রয় করে পড়ে আছি দীর্ঘদিন ধরে। আপনার কৃপা হলে শ্রীরামচন্দ্রেরও কৃপা লাভ করব এই আমাদের আশা।

—না কৃষ্ণদাস আশ্রম ত্যাগ না করলে সবাই মরবে।

—প্রভু সে মরণেও হবে আমাদের শান্তি—এত বড় নির্মম আদেশ আপনি দেবেন না। আমাদের যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে বুকের রুধির দিয়ে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করব।

গুরুদেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোমরা সবাই চেয়ে দেখো আমার প্রেমের ঠাকুর মুখ ফিরিয়ে আছেন। আজ ত্রিশ বছর ধরে আমি ভোগ নিবেদন করছি। তিনি প্রসন্ন মনেই তা গ্রহণ করেছেন। আজ তিনি ভোগ গ্রহণ করলেন না।

কৃষ্ণদাস কাঁদছেন।

কাঁদছেন আশ্রমবাসীরা।

কাঁদছে ঐ খাঁচার পাখীরা।

কাঁদো! কাঁদো! না কাঁদলে তো তাঁকে বাঁধা যাবে না। চোখের জলে তাঁর আসার পথ পিছল করে দাও তিনি ঠিক তোমার বুকে এসে আছড়ে পড়বেন।

ভগবান তো ভক্তের কাছে চিরকাল বাঁধা।

যাবেন কোথায়? প্রেমের জোরে ভক্তি রজ্জুতে তো তিনি বাঁধা। কাঁদো কৃষ্ণদাস! বলো তুমি শুধ্ দাস নয়, তুমি দাসানুদাস। কাঁদতে কাঁদতেই বাঁধতে হবে।

ছেলে কাঁদলে মা আর কতক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে? এসে তাকে কোলে তুলে নিতেই হবে।

কৃষ্ণদাস গুরুদেবের পা জড়িয়ে ধরে বললেন, প্রভু কি অপরাধ হল?

—আমি সারাদিন ধরে চোখের জলেই তাঁর কাছে জানতে চেয়েছি। তিনি কোন জবাব দিলেন না।

সারা আশ্রম নীরব নিথর।

সবাই অশ্রুসিক্ত নয়নে চেয়ে আছে গুরুদেবের দিকে।

প্রেমের ঠাকুর ভগবান রামচন্দ্র আজ সারাদিন উপবাসী। এ দুঃখ রাখবার জায়গা কারও কোথাও নেই।

অপরূপ লীলা তোমার! নিজেও কষ্ট পাচ্ছো আর সবাইকেও কষ্ট দিচ্ছ। তুমি সব পার! তোমার অসাধ্য কি আছে জগতে! মুখ ফিরাও। তোমার দয়াল নামের অপবাদ হবে।

"জয় রাম জয় রাম"—গুরুদেব বলে উঠলেন।

সবাই যেন চমকে ওঠে।

রামানন্দ স্বামী ডাকদিলেন, কৃষ্ণদাস!

—গুরুদেব!

—আজ ভোগ রান্না কে করেছে?

—আমি প্রভু!

—রাঁধবার সময় দেহে মনে বেশ পবিত্র ছিলে?

—হ্যাঁ প্রভু?

—কোন স্ত্রীলোকের মুখ তোমার স্মরণ পথে আসে নি তো?

—না প্রভু, রামনাম ছাড়া আমি তো কিছু জানি না। রাঁধবার সময় আমি ঐ নামেই মত্ত ছিলাম। গুরুদেব আমার ধ্যান জ্ঞানই তো ঐ নাম। ঐ নামেই আমার নিশ্বাস বইছে!

—তবে।

গুরুদেব এবার আরো চিন্তিত হলেন।

সারা জীবনের সাধন ভজন বুঝি তাঁর ব্যর্থ হয়ে যায়। এবারের যাত্রা তাঁর কোন কাজে লাগলো না। আবার আসতে হবে, আবার হাসতে হবে, আবার কাঁদতে হবে—এ জন্মে এগিয়ে গিয়েও পা ফস্‌কে গেল।

রামানন্দর চোখে যেন আগুন জ্বলছে।

—আজ ভিক্ষায় বের হয়েছিল কে?

রামানন্দ থর থর করে কাঁপছেন বেতস পত্রের মত।

—কে ভিক্ষায় বের হয়েছিল?

রামদাস হাত জোড় করে বললেন, আমি প্রভু!

গুরুদেব চুপ করে থেকে বললেন, না। তোমাদের কোন দোষ নেই! তোমরা আমার কত প্রিয়। তোমাদের যে ভয়, নিষ্ঠা ভক্তির প্রমাণ পেয়েছি তাতে তোমরা কেউ দোষী নয়।

রামদাস তেমনি ভাবে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, তবে ঠাকুর ভোগ নিলেন না কেন?

—সবই আমার দোষ, আমার অপরাধেই ঠাকুর আজ রুষ্ট হয়েছেন! সব অপরাধ আমার—এ জীবনে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই—এ অপরাধী জীবন আমি শেষ করে ফেলব। এ জীবন দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। অচল পয়সায় কোন জিনিষ সওদা করা যায় না রামদাস। অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে বেশীদূর যাওয়া যায় না কৃষ্ণদাস। আমি জীবন বিসর্জন দেব।

রামদাস বালকের মত কাঁদছেন—ঠাকুর! গুরুদেবের যদি কোন অপরাধ হয় তুমি ক্ষমা করো। তুমি আমাদের যে শাস্তি দেবে আমরা তা মাথা পেতে নেব।

গুরুদেব মন্দিরের দিকে একবার তাকালেন—

ভগবান রামচন্দ্র তেমনি ভাবে বিষণ্ণমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। সারা মুখে যেন কৃষ্ণ মেঘের ঘনঘটা।

রামানন্দ স্বামীর মুখেও যেন বিষাদের ছায়া। তিনি বললেন, আচ্ছা রামদাস! তোমার জীবন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই আমি জানি। মিথ্যা কথা, মিথ্যাচারণ তোমার জীবনের কোন জায়গায় কোনদিনই উঁকি মারেনি এই আমার বিশ্বাস।

—হ্যাঁ প্রভু, রামচন্দ্রই আমার কাছে সত্য। জীবনে সত্যানুসন্ধানই আমার ব্রত।

—স্মরণ করে দেখ তো আজ ভিক্ষা করবার সময় আমার নির্দেশ

ঠিকমত পালন করেছিলে কিনা ? কোন ক্রটি, কোন ভুল তো হয়নি !

রামদাস কাঁপছেন।

—ওকি কাঁপছ কেন রামদাস ? জবাব দাও !

—মনে হয় আজ আমার ভিক্ষাবৃত্তিতে ক্রটি হয়েছে।

—কি সেই ক্রটি ?

রামদাস নীরব।

গুরুদেব গর্জে উঠলেন, বললেন, রামদাস কি সেই ক্রটি ? যার জন্য আমার আরাধ্য দেবতা এখনও পর্যন্ত উপবাসী, বল রামদাস কি সেই ভুল যার জন্য আশ্রমের সবাই এখনও পর্যন্ত প্রসাদ পেলনা।

রামদাস সোজা হয়ে দাঁড়ালেন—বললেন, আপনার নির্দেশ ছিল প্রতি বাড়ী থেকে অর্ধ মুষ্টির বেশী ভিক্ষা নেব না। আমি কোনদিন এ নির্দেশ অমান্য করিনি। চিরকাল আমি এ নির্দেশকে বেদবাক্য বলেই গ্রহণ কোরে এসেছি। কিন্তু আজ !

—বল আজ কি করেছ ?

—প্রভু সকাল থেকেই আজ দুর্যোগ, ঝড় বৃষ্টিতে পথ চলার বড়ই কষ্ট হচ্ছিল তবুও আমি থামিনি।

—তারপর !

—এক মহিলা নিত্য আমাকে ভিক্ষা করবার সময় তার দরজায় এসে দাঁড়ান। মাঝে মাঝে তিনি বলেন, বাবা বাড়ী বাড়ী অর্ধ-মুষ্টি ভিক্ষা করায় আপনি বড় কষ্ট পান। আমি বলি কি তা না করে সব মুষ্টি চাল যদি আমার কাছ থেকে নিয়ে যান তাহলে আপনার অনেক কষ্ট লাঘব হবে। প্রভু আমি কোনদিন তা গ্রহণ করিনি।

—বেশ তো।

—কিন্তু আজ ?

—আজ কি হল রামদাস ? বল সব খুলে বল !

—বলছি প্রভু! আজও তিনি আমায় বললেন—বাবা এই দুর্যোগে আর আপনি দোরে দোরে ঘুরে না বেড়িয়ে আমার কাছ থেকেই ত্রিশ মুষ্টি চাল নিয়ে যান। আপনার পরনের বসন সিক্ত। চরণ যুগল কর্দমাক্ত।

—কি করলে তুমি!

—আমি গ্রহণ করেছি গুরুদেব!

—কি সর্বনাশ! কে সেই মহিলা?

—এখানকার বিখ্যাত এক সুদখোরের স্ত্রী।

—সুদখোরের দেওয়া তণ্ডুলে ভোগ, তাই আজ ঠাকুর গ্রহণ করলেন না।

গর্জে উঠলেন রামানন্দ, এদিকে এস।

রামদাস এগিয়ে যেতেই তাঁর পিঠে পদাঘাত করে বললেন, চামার কোথাকার। দূর হয়ে যাও আশ্রম থেকে। সুদখোরের দেওয়া জিনিষে কোনদিন দেবতার ভোগ হয় না একথা তুমি জাননা পাষণ্ড! ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেও তুমি চামারের মত আচরণ করেছ—পরজন্মে তুমি চামারের ঘরে জন্ম গ্রহণ করবে। ত্রিশমুষ্টি চাল নেবার জন্য তোমাকে ত্রিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। তারপর তুমি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাবে। যাও এখুনিই তুমি দূর হয়ে যাও।

রামদাস অঝোরে কাঁদছেন।

সারাদেহ যেন তাঁর মুচড়ে দুমড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। রামাদাস করজোড়ে নিবেদন করলেন, চামারের ঘরে জন্ম হলে তো সেই মানুষের ঘরেই জন্ম হল। আমি কীট পতঙ্গ হয়েও জন্ম নিতে রাজি আছি। প্রভু শুধু আশীর্বাদ করুন, আমি যেন ভগবান রামচন্দ্রকে না ভুলে যাই। যেখানেই জন্মাই তাঁর নাম যেন আমার সারা দেহ মনে জড়িয়ে থাকে। বড় শান্তি আমার। তবুও তো ত্রিশ বছর বাদে তাঁর দর্শন পাবো। কত জনে কোটি জনম তপস্যা

করে তাঁর দর্শন পায় না তার কাছে ত্রিশ বছর তো এবেলা ওবেলা। আমি ভাগ্যবান।

কৃষ্ণদাস গুরুদেবের পা জড়িয়ে ধরে বললেন, প্রভু রামদাসকে আপনি ক্ষমা করুন। রামদাস এই আশ্রমের প্রাণ, ওকে ফিরিয়ে নিন।

রামদাস জবাব দিলেন, না কৃষ্ণদাস! গুরুদেবকে সত্যভ্রষ্ট করো না—তাঁর আশীর্বাদ আমার মাথায় মুকুট হয়ে থাক। আমি চলে যাব শুধু আশ্রম ছেড়ে নয়—এ দুনিয়া ছেড়েই আমি চলে যাব। কারণ এদিকে যতদিন থাকব ওদিকে তত দেরী হয়ে যাবে।

রামদাস সকলের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন।

মুখে তাঁর রামনাম।

"জয় রঘুপতি রামচন্দ্র!"

রামানন্দ স্বামী কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থেকে বললেন মন্দিরের দিকে চেয়ে,—ঠাকুর কৃপা করো!

রামদাস সময় আর নষ্ট করতে দিতে চায় না। বড় আনন্দ তাঁর। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাবেন!

চামার তো ভাল আরও নিকৃষ্ট কারও গর্ভে তিনি জন্ম নিতে রাজী আছেন! পশুপক্ষী, গুল্মলতা, পোকা-মাকড় যে কেউ তাঁর জননী হোক তাতে কি আসে যায়। ভগবানের দর্শন পাবেন এর চেয়ে বড় শান্তি বড় ভাগ্য আর কার আছে।

রামদাস আশ্রম ছেড়ে চলেছেন বন-জঙ্গল পার হয়ে।

সূর্য ডুবে গেছে অনেক্ষণ—অন্ধকার তার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে চারিদিকে।

জঙ্গলের পথ ধরলেন। এ কেমন জঙ্গল। বাঘ ভালুক নেই। সে কোন ক্ষুধার্ত জীবের আহার হতে চায়। সময় চলে যায়। লগন বয়ে যায়। পুরানো বস্ত্র খুলে ফেলে এবার নতুন বস্ত্র-পরিধান করতে হবে। অনেক ময়লা জমেছে এ বস্ত্রে। অনেক ক্লেদ জমে আছে এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আর এ বস্ত্রের প্রয়োজন কি।

কিন্তু কেউ কি তাঁকে সেব্য হিসাবে গ্রহণ করবে না?

তবে! কি হবে—

এগিয়ে চলেছেন রামদাস! অন্ধকারে বন-জঙ্গল ভেঙে কে যেন আসছে। কোন বন্য জন্তুই হবে বোধ হয়!

রামদাস রামনাম জপ করছেন। বড় আনন্দ তাঁর তিনি মরেও সেবায় লাগবেন।

অন্ধকারে কি জন্তু বোঝা যায় না। চোখ দুটো জ্বলছে।

রামদাস হাতজোড় করে বললেন, তুমি যেই হও আমাকে গ্রহণ করে আমাকে পথ এগিয়ে দাও—কৃপা করে আমাকে গ্রহণ কর!

কিন্তু না জন্তুটা অন্যপথ ধরে চলে যায়।

সারারাত বন-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে তিনি অক্ষত রয়ে গেলেন!

নিজের জীবনের ওপর তাঁর বড় ধিক্কার এলো।

এ প্রাণ-দেহ কেউ কি তাহলে স্পর্শ করবে না?

ধীরে ধীরে ভোর হয়।

দূরে একটা নদীর মত কি দেখা যাচ্ছে না?

হ্যাঁ এইবার পেয়েছি—

ছোট্ট একটা নদী, জলে স্রোত আছে, কুল কুল করে বয়ে চলেছে।

রামদাস নদীর ধারে গিয়ে চারিদিক চেয়ে দেখলেন। মায়ের কোলে ঝাঁপ দেবার এই তো উপযুক্ত সময়।

তিনি কূলে বসে রামচন্দ্রের ধ্যান করলেন। তারপর তিনি জয় রামচন্দ্র বলে ঝাঁপ দিলেন।

দেখতে দেখতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ার মত নদীর বুকে চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে দেরী হলে ওদিকে দেরী হয়ে যাবে তাই রামদাস তাড়াতাড়ি এদিকের কাজ শেষ করে ফেললেন।

আশ্বাস না পেলে কি বিশ্বাস হয়।

যিনি ভাবতে পারেন আশ্বাসেও তিনি, বিশ্বাসেও তিনি। তাঁর পথ অনেক কমে যায়।

মানুষের সংসারে বিশ্বাসের বড় অভাব।

পাথরের দেবতা। মাটির দেবতা কি শুধু মাটি আর পাথর?

সন্দেহ হয়। অবিশ্বাস হয়।

প্রাণ যার নেই সে তো মৃত।

আবার কখনও—

হ্যাঁ কখনও সন্দেহ হয় না—

অবিশ্বাস হয় না—

প্রাণ যার নেই সেই তো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

কি ভাবে তা হয়।

ভক্তি ও প্রেমের বারি সিঞ্চনে।

আকিঞ্চনের মত এ সিঞ্চন করে যে তা ব্যর্থ হয় না।

তুমিও পেতে পার।

আমিও পেতে পারি।

তুমিও দেখতে পার।

আমিও দেখতে পারি।

যদি ভাবতে পারি—তোমাকে আমি চিনি। তুমিই তো আমাকে পথ দেখাচ্ছ—বিপদে-আপদে বন্ধুর মত তুমিই তো দেখছ। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে। এই তুমিই তো আমার আমি।

রামদাস সেই আমির ঠিকানা জেনেছিল তাই ভক্তি প্রেমের

টিকিট লাগিয়ে নদীর বুকে আছড়ে পড়ল।

ওটা তো নদী নয়—যেন পোষ্ট অফিসের ডাকবাক্স।

রামদাস টিকিট এঁটেই ঢুকে পড়ল।

এ দুনিয়ায় অবিশ্বাসী মানুষ আর বিয়ারিং চিঠি একই, সব সময় প্রাপকের হাতে পৌঁছায় না! মাঝ পথেই মারা যায়।

হে রামচন্দ্র! ভক্তি আর প্রেমের টিকিট যেন পাই এই দয়া ভিক্ষা করি।

এ জগতে সুখী কে? তার ঠিকানা কি কেউ জানে? কেমন করে সে সুখী হল তা কি সে বলতে পারে! অর্থ, বিষয়, বৈভব, ধন-সম্পত্তি যার আছে সেই বুঝি সুখী। ওরে বাবা অমুকের কত বড় বাড়ী। কত দাস-দাসী। গাড়ী-ঘোড়া। কি সুখেই যে আছে তা বলবার নয়। কত সোনা-দানা। কত ভাল মন্দ খায়। কপাল করে এসেছে বটে।

এরই নাম সুখ! তাই তো সবাই বলে—

না গো না—সংসারে ওদের মত দুঃখী কেউ নেই। ওদের কষ্ট দেখলে সত্যিই মন-প্রাণ হাহাকার করে ওঠে।

ঐ বুঝি চোর এল। ঐ বুঝি ডাকাত পড়ল। ঐ বুঝি কে ফাঁকি দিয়ে সব নিয়ে নিল। এই চিন্তাতেই তো পাগল।

এই চিন্তাতেই ব্যাধির সৃষ্টি।

সকাল থেকে রাত, রাত থেকে ভোর। এই ব্যাধিতেই ওরা ভুগছে।

এর নাম বুঝি সুখ? এর নাম বুঝি শান্তি?

ভগবানের নাম যেখানে নেই, তাঁর কথা যেখানে নেই, সে জায়গা তো মরুভূমি। ঐ মরুভূমির মাঝে বসে যারা সোনা দানা নিয়ে দিন কাটায় তাদের মত অসুখী আর কে আছে?

জীবনে সুখ কিসে?

ভগবান অন্বেষণে—

অসুখী সবচেয়ে কে ?

ভগবানকে ভুলে যে থাকে।

এ জগতে পাঁচটি অমূল্য রত্ন আছে—এই পাঁচটি রত্ন যার ঘরে আছে সেই তো রাজাধিরাজ। তার মত সুখী, তার মত ধনী আর কোথাও নেই।

সে পাঁচটা রত্ন কি কি ?

সাধুসঙ্গ, নামে রুচি, বিবেক, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা।

ত্রিশমুষ্টি চাল যে একসঙ্গে দিয়েছিল রামদাসকে সেও তো বিরাট ধনী কিন্তু সুখ কি তার আছে। স্বামী সুদখোর। মানুষের চোখের জলের ওপর তৈরী হয়েছে তার বিরাট প্রাসাদ। একজনকে পথে না বসালে আর একজন রথে উঠতে পারে না। ঐ মহিলার স্বামী মানুষকে প্রবঞ্চনা করে। তাদের পথে দাঁড় করিয়ে নিজের অর্থের অঙ্ক ভারী করেছে।

অথচ তার স্ত্রী জানলায় দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে।

সুদখোরের স্ত্রীর চোখে জল !

রামদাসের মৃত্যু সংবাদ সে জেনেছে, আশ্রম থেকে নির্মম ভাবে নির্য্যাতন করে তাড়ানো হয়েছে সে খবরও সে জানে—একটা দাসী সঙ্গে করে ঐ মহিলা চলেছে স্বামী রামানন্দর আশ্রমে।

রামানন্দ স্বামী ভোগ নিবেদন করার পর শিষ্যদের প্রসাদ বিতরণ করছেন। মন্দিরে রামচন্দ্রের বিগ্রহ। ধূপ-ধূনার গন্ধে মন্দির প্রাঙ্গন মুখরিত।

মহিলা ধীরে ধীরে এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়ালেন।

এক চোখে জলের ধারা, আর এক চোখে তীব্র জ্বালা।

রামানন্দ স্বামী এগিয়ে এসে বললেন, প্রসাদ নাও মা।

মহিলা বললেন, ঐ প্রসাদ নেওয়া আমার নিষেধ আছে।

চমকে উঠলেন রামানন্দ স্বামী! নিষেধ আছে? ভগবান রামচন্দ্রের অমৃতময় প্রসাদ নিতে তোমার মানা? কেন মা?

— হ্যাঁ ও প্রসাদ আমি গ্রহণ করব না। ভগবান রামচন্দ্র কি শুধু আপনাদের? আর কি কারও তিনি নন?

—এ কথা কেন মা? তিনি তো সবার—

—সবার বলতে কি বোঝাচ্ছেন?

—এ পৃথিবীতে যা কিছু দৃষ্ট হয়, সবই তো তাঁর। সব কিছুতেই তো তিনি। অনলে-অনিলে, আকাশে-বাতাসে, লতা-গুল্মে, কীট-পতঙ্গে সব কিছুতেই তিনি আছেন! তিনি যে সর্বত্র বিরাজমান।

—হ্যাঁ আমিও তাই জানতাম—তুলসীদাস বলেছিলেন,

"ফুল মাহি যেঁও বাস কাটমে অগিন ছিপনি
খোদ্ বিন নাহি মিলে ধরতী মে পানি"

—ঠিক বলেছ মা। তুলসীদাস ছাড়া একথা কে বলবেন—পুষ্পমধ্যে যেমন সুগন্ধ, কাষ্ঠের মধ্যে যেমন অগ্নি সন্নিহিত থাকে তেমনি ভগবানও সর্বভূতে বিরাজমান।

একটু থেমে বললেন, কিন্তু প্রসাদ নিলে না কেন?

মহিলা মাটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ সুদখোরের স্ত্রীর দেওয়া অন্নে সেদিন রামচন্দ্রের ভোগ হয়নি। যার জন্য একজন সরল শিশুর মত সন্ন্যাসী রামদাসকে নদীতে আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছে। আমি সেই সুদখোরের স্ত্রী হয়ে কি করে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করি।

—তুমিই সেই সুদখোরের স্ত্রী?

—হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করুন তো রামচন্দ্রকে! তিনিই তো আমার স্বামীর ভিতরে বিদ্যমান থেকে সুদখোর হতে সহায়তা করেছেন। তিনি তো পারতেন তাঁকে সৎপথে চালনা করতে। কই জবাব দিন?

রামানন্দ বললেন, মা !

—আমি জানি জবাব আপনি দিতে পারবেন না। শুনে রাখুন। সেদিন যে চাল আমি দিয়েছিলাম সেও আমার ভিক্ষাবৃত্তি করা চাল। আমি স্বামীর উপার্জিত ধন থেকে তা দিইনি।

—ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেবার জন্য যে ভিক্ষা করে সে তো সাধারণ নয় মা! তোমার এ ভক্তি সংসারে তুলনাহীন।

মহিলা এবার ক্রোধে ফেটে পড়লেন।

বললেন, একটা তাজা প্রাণ শেষ করে কি লাভ হল রামচন্দ্রের? চিরকাল তো তিনি সবাইকে কাঁদালেন।

—কি ভাবে মা?

—কেন সত্য যুগে লক্ষ্মীকে কাঁদতে হয়নি? ত্রেতা যুগে তিনি সীতাকে কম কষ্ট দিয়েছেন। দ্বাপরে শ্রীরাধিকার চোখের জল শুকায় নি। কলিতে বিষ্ণুপ্রিয়াও কেঁদেছেন।

স্বামী রামানন্দ হাসলেন, চোখের জলেই তো তাঁর উপস্থিতি, যে যত তাঁর জন্য কাঁদতে পারবে সে তত বাঁধতে পারবে। আকুল হয়ে কাঁদতে হবে, ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে হবে—সে কান্নার উচ্ছ্বাস হবে পুত্রশোকের চাইতেও বেশী। সে কান্নার বেগ হবে বিষয় হারানোর চাইতেও বেশী। তবেই তো তিনি কৃপা করবেন। তিনি যে পরম দয়াল মা।

মহিলা রামানন্দকে প্রণাম করলেন—

রামানন্দ বললেন, রামচন্দ্র তোমাকে কৃপা করবেন। মাটি খুঁড়ে যাও জল ঠিক মিলবে।

—কিন্তু আমি যে সুদখোরের স্ত্রী—

—ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেবার জন্য যে নিজে ভিক্ষা করে সে রামচন্দ্রকে অবশ্যই পাবে।

মহিলা ধীরে ধীরে রামানন্দ স্বামীকে প্রণাম করে আশ্রম প্রাঙ্গণ ত্যাগ করলেন।

রামদাস বিহনে সারা আশ্রম যেন বেদনাক্লিষ্ট। খাঁচার পাখীরাও নীরব।

কৃষ্ণদাস ব্যথা ভরা মন নিয়ে সব কিছু করে বেড়ায়।

রামদাস তার পুরানো জীর্ণ বাড়ী ত্যাগ করে চলে গেছে। এখন সে বোধ হয় নতুন বাড়ীতে উঠেছে। নতুন ঘরে তার আরাধ্য দেবতা রামচন্দ্রকে আহ্বানের জন্য উদগ্রীব হয়ে বুঝি ঘর সাজাচ্ছে।

যেতে হবে, আসতে হবে। এ ঘর থেকে ও ঘর। ও ঘর থেকে আর এক ঘর। এর মাঝে যেটুকু সময় পাওয়া যায় কাজ গোছাতে হবে।

কি সেই কাজ?

ঈশ্বরানুসন্ধানের কাজ।

সময় বৃথা বয়ে গেলে সন্ধানের কাজে দেরী হয়ে যাবে। মন দিয়ে, ভক্তি দিয়ে যাঁকে খুঁজলে অবশ্যই পাওয়া যাবে তাঁকে খুঁজে পেলে লাভ ছাড়া লোকসান হবে না।

রামানন্দ স্বামী গুন গুন করছেন—জয় রামচন্দ্র! জয় রামচন্দ্র!

॥ দুই ॥

কাশীর গঙ্গার ঘাট থেকে উঠে ওপরের রাস্তা দিয়ে কিছু দূর গেলেই একটা ছাতিম গাছ। ঐ ছাতিম গাছের ছায়ায় বসে এক মুচি মনের আনন্দে গান গায় আর আপন মনে জুতো সেলাই করে। কে আসছে, কে যাচ্ছে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই আপন মনে গেয়ে চলে।

"দীপশিখা সম যুবতী রসমন
জানিহো নি পতঙ্গ।
ভজহি রাম, ত্যাজ কামনা
করহি সদা সৎসঙ্গ ॥"

(অর্থ—যুবতী রমণীগণ জ্বলন্ত দীপশিখার সমান আর পুরুষেরা পতঙ্গ স্বরূপ। কাজ পরিত্যাগ করে রামভজন কর।)

চামড়া কাটার যন্ত্রটা চামড়ায় ঘসে ধার করে, আর বলে—বেশ আছি। জুতো সেলাই করি, সারাদিনে যা রোজগার হয় তার একভাগ যায় দেবসেবায়, একভাগ যায় সাধুসেবায় আর একভাগ নিজের জন্য। আমার মত সুখী আর কে আছে। জয় রাম, জয় রাম।

কখনও আপন মনেই হাসে, কখনও চুপ করে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুজে বসে থাকে। কখন দুপুর হয়, বেলা বাড়ে তাতে তার খেয়াল থাকে না। খুরপাইয়ের ওপর জুতো রেখে পেরেক মারে আর আপন মনে হেসে হেসে বলে—ইচ্ছে করে এমনি করে পেরেক

মেরে মেরে সারা দেহটা ফুঁড়ে ফেলি। কি হবে এ দেহ দিয়ে—কাজেই যদি এ দেহ না লাগে তাহলে এমন দেহ রেখে কি হবে। ঠাকুর তোমার লীলা কি বুঝবে এ চামার? -যাক যা হয় হবে, ডেকে তো যাই, দেখি একদিন তোমার সাড়া মেলে কি না! তিরিশ বছর কবে পার হবে তা কে জানে! বয়স এখন কত তাই বা কে জানে! ডেকে তো যাই, চোখের জলে তাঁর পূজা করে যাই। আসে দেখব, না আসে দেখব না।

আর একটা পেরেক ঠুকে বলে, দূর শালা এই আসা-যাওয়া কি বার বার ভাল লাগে? জয় বাবা রামচন্দ্র! হনুমান আর কাঠবিড়ালিও তোমার কাজে লেগেছিল। আর আমি একটা আস্ত মরদ তোমার কি কোন কাজেই লাগব না? চামারের ঘরে জন্মেছি বলে তুমি কি আমাকে কৃপা করবে না?

অজান্তে দুফোঁটা চোখের জল খুরপাইয়ের ওপর পড়ে।

কি রে চোখে আর জল নেই, দুফোঁটা ফেললি কেন, আরও ফেল, খুরপাইটাকে স্নান করিয়ে দে।

দেখতে দেখতে দুচোখ দিয়ে অবিরাম জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে।

জয় রামজী! জয় রামজী! কৃপা কর! দয়া কর!

ছাতিম তলার ঐ মুচি ভক্ত রুইদাস আনুমানিক ১৫শ ১৬শ শতকের মধ্যভাগে কাশীতে এক চামারের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তৎকালের তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাধক। গুরু রামানন্দের দ্বাদশ জন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর প্রেমভক্তির কথা সর্বজন বিদিত। ভক্তিতে যে ভগবান মেলে তার প্রমাণ রুইদাস। সারা জীবন তিনি কঠোর সাধনা করেছেন—দেহের কষ্টও তাঁকে জর্জরিত করেছে কিন্তু তিনি সব কিছুই তুচ্ছজ্ঞান করে পরমানন্দে রামনাম করছেন।

কবীর ও মীরাবাঈয়ের রচনায় রুইদাসের নাম ছড়ানো রয়েছে। শিখধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেবের ভিতরে রুইদাসের অনেক ভজন রয়েছে এবং শিখ ভক্তরা তাঁর ভজনবাণী পরম শ্রদ্ধা ভরে গেয়ে থাকেন। এইসব দেখে মনে হয় শিখদের ধর্মের সঙ্গে তাঁর মতের অনেক মিল ছিল।

রুইদাস নিজে একটা ধর্মমতের প্রবর্তক।

সে-মত ভক্তি প্রধান—

এরজন্য পরম বৈরাগ্য ও একনিষ্ঠতা প্রয়োজন। পরমাত্মা অন্যায় ও অবিনশ্বর। জীবাত্মারূপেই প্রতিটি জীবের মধ্যে বর্তমান।

ভারতবর্ষের সর্বত্রই রুইদাসের বহু অনুগামী আছেন। তাঁরা নিজেদের বৈরাগী নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন। রুইদাসের নিজের মত নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম প্রচার করেছিলেন।

সবই এক। এক ছাড়া দুই নেই।

বাড়ীর মালিকের ঠিকানা না জানলে এপথ ওপথ ঘুরতে হয়। কেউ বেশী ঘোরে, কেউ কম ঘোরে। কিন্তু এক সময় না এক সময় সবাই বাড়ী খুঁজে পায়।

পথ আলাদা কিন্তু মালিক তো এক। যে যে পথেই যাও মালিককে খুঁজে পাওয়া নিয়ে কথা।

ঠিকানা জানা চাই। ঠিকানা যারা জানে তাঁরা ঠিকই খোঁজ পায়।

রুইদাস ঠিকানা জানতেন তাই এক জনম রাস্তা ঘুরে হয়রান হয়ে পরজন্মে পেয়ে গেলেন।

ঠিকানা জানতে হবে।

এ ঠিকানা জানতে হলে সাধনার দরকার।

সে সাধনার জন্য চাই শুদ্ধ দেহমন। যাতে ভক্তি আর প্রেমের বীজ পড়লে অবশ্যই ফসল ফলবে।

কিন্তু ভক্তি আর প্রেমের বীজ মিলবে কোথায়?

গুরুর আড়তে, সাধুসন্তের আড়তে।

রুইদাস আজন্ম শরণাগত, সাধনারত।

ভক্তি আর প্রেমের এক বিরাট খনির তিনি মালিক ছিলেন। তাই তিনি পেয়েছিলেন পরম বস্তুর সন্ধান।

॥ তিন ॥

রুইদাস চামারের ঘরে জন্ম নিলেন। কিন্তু পূর্বের কথা কিছুই ভুললেন না। ঐটুকু শিশু কেবল কাঁদে। দুধ খায় না। একি অবাক কাণ্ড! মা বাবা ভাবলেন, এ কি করে বাঁচবে?

শিশু রুইদাস সব সময় চারিদিক চেয়ে থাকে আর কাঁদে। মুখে কিছু দিলে খায় না।

বৈদ্য ডেকে নিয়ে এলেন বাবা।

ওষুধ দিলেন—ওষুধও শিশু খেল না।

শিশু সব সময় কাকে যেন খোঁজে। কাকে পেলে বুঝি তার শান্তি হয়।

দিন দিন শিশু শুকিয়ে যায়। মা বাবা চোখের জল ফেলেন। পাড়া-প্রতিবেশী সান্ত্বনা দেয়। কেউ বলে ঝাড়-ফুঁক করা দরকার; কিন্তু শিশু যে গুরু রামানন্দ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে তা কে জানে।

ঠিক এমনি সময়ে রামানন্দ স্বামী কাশীধামে এসেছিলেন অন্নপূর্ণা দর্শনে।

পথ দিয়ে চলতে চলতে তিনি মুচি দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়েন। আর তাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। না হল না—

মুচিদের আস্তানা খুঁজে খুঁজে বার করলেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন এক মুচির ঘরে আজ কয়েক মাস হল একটা ছেলে হয়েছে, সে দুধ খায় না, শুধু কাঁদে।

তিনি গেলেন সেই চামারের ঘরে।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে অবিরাম কাঁদছে সেই শিশু।

রামানন্দ স্বামী গিয়ে দাঁড়ালেন শিশুর সামনে। শিশুর কান্না থেমে গেল এক নিমিষে।

রামানন্দ একদৃষ্টে চেয়ে আছেন শিশুর দিকে।

পরে বললেন, ওকে দুধ দাও, ঠিক খাবে!

মা দুধের বাটি ওর মুখে ধরতেই ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিল।

মা বাবা আছড়ে পড়ল রামানন্দের পায়।

—আপনি কে বাবা, আমার ছেলেটা মরেই যেত!

রামানন্দ বললেন, দূর বেটা! ও মরতে আসেনি। ও বাঁচবে, আর দশজনকে বাঁচাবে!

একটু থেমে বললেন, দেখিরে ওর পিঠটা!

—কেন বাবা? মা বলে ওঠে।

—দেখি না ওর পিঠটা!

শিশুর পিঠে একটা পায়ের ছাপ!

—ওটা কি বাবা?

—দেখছি তো একটা পায়ের ছাপ।

—কেন বাবা?

—ও যখন বড় হবে তখন ওর মুখেই শুনিস। জয় রামচন্দ্র! জয় রামচন্দ্র!

রামানন্দ স্বামী প্রিয় শিষ্যকে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রুইদাস সাবালক হয়ে বাবা ও মাকে সমস্ত ঘটনা বলেছিল।

ধন্য তোমরা চামার চামারণী। বহু ভাগ্য করে অমন ছেলে পেটে ধরেছ। তোমরা মহা ভাগ্যবান ভাগ্যবতী!

এক মহান জ্ঞান-তাপস সাধক তোমাদের সন্তান হয়ে জন্মেছে। সন্ত তুলসীদাসের কথা মনে পড়ে যায় রুইদাসের কান্না দেখে।

"তুলসী! যব জগমে আয়ে জগ হাসে
তোম রোয়।
ঐ সি করনে কর চলো কি তোম হাসো
জগ রোয়।"

হে তুলসীদাস! তুমি যখন জন্মেছিলে তখন সবাই হেসেছিল, আর তুমি কেঁদেছিলে। এখন তুমি এমন কাজ করে চলে যাও হাসতে হাসতে, সবাই যেন তোমার জন্য কাঁদে।

গাছতলায় বসে রুইদাস এক মনে ভজন গেয়ে চলেছেন আর হাতে কাজ করে চলেছেন। সাধুসন্ত দেখলেই তাঁদের সম্বর্ধনা করে পায়ের ধূলো মাথায় নিতেন। দু'একজন সাধুসন্ত তাঁর হাত থেকে পয়সাকড়ি নিলে তিনি আনন্দে নৃত্য করতেন।

একমনে জুতা সেলাই করে চলেছেন আর আপন মনে বলছেন— ঠাকুর! আমার ডাক তোমার কানে যাবে না? এ চামার ছোট জাতের ডাক তোমার কানে গেলে যে তোমায় গঙ্গায় ডুব দিতে হবে। জন্মাবধি তোমায় ডাকছি, তোমার জন্য কাঁদছি, কই সাড়া তো দিচ্ছ না। ঠাকুর, সাড়া না দাও না দিও কিন্তু ডাকতে যেন পারি। জুতা আমি সেলাই করি, কিন্তু তুমি আমার মুখ সেলাই করে দিওনা যেন। তার চেয়ে আমার মরণই হবে ভাল। জয় রাম! জয় রাম!

আপন মনে আবার বলে—কি রে কাটছিস না কেন? ধার নেই বুঝি? দাঁড়া ঘসে নি চামড়ায়।

একটু হেসে ওঠেন রুইদাস—না ঘষলে ধার বাড়ে না। ঠিক শালা আমার মত হয়েছিস, দিনরাত জিভ ঘসছি রাম রাম করে, কই মনের ময়লা তো কাটছে না! এ ময়লা না কাটলে তো সেই দয়াল রঘুনাথ আসবে না।

—এ রুইদাস ভাই, আমারটা একটু সেলাই করে দাও?

—আজ হবে না ভাই! তুমি তো জানো আমি সারাদিনে

তিন জোড়া জুতা সেলাই করি।

—কাঁচা ব্যবসাদার তুমি। মানুষ লাভের জন্যই তো ব্যবসা করে। আর তুমি বেটা না খেয়ে মরছ।

—এ ভাই! এ কি কথা বোলছ? ভগবানের রাজত্বে আমি না খেয়ে মরব কেন? তিন জোড়া জুতা সারলেই আমার সব কাজ হয়ে যায়।

—বল কি?

—হ্যাঁ ভাই, এক জোড়ার পয়সা দেবসেবা; আর এক জোড়ার পয়সা সাধুসেবা, আর এক জোড়ার পয়সায় আমাদের দুটো পেট চলে যায়। কোন অভাব আমার নেই!

—বেটা মুচি না হলে এ কথা আর কে বলবে? বেটা আমার পয়সাটা পেলে তো জমবে। ভবিষ্যৎ নেই?

—আরে ভাই, এই আছি এই নেই! যে দুনিয়ার হাল, সে দুনিয়ায় জমাবো কার জন্য? মানুষের আবার ভবিষ্যৎ কি? আজকের রাত পোহালে খেলাম, কাজ করলাম, ভগবানকে ডাকলাম! ব্যস্, মহানন্দে দিন গেল। কালকের কথা কাল ভাবব। বেনিয়া যারা তারা পয়সা জমায়। আমি যে রামচন্দ্রের প্রজা। আমার তো কোন দুঃখ নেই!

লোকটা ছেঁড়া জুতা হাতে করে চলে যায়।

রুইদাস হাঁকে আর গান গায়—

"পলটু উচি জাতকা মত কোই কর অহঙ্কার,
সাহেবকে দরবার সে কেবল ভক্তি পিয়ার।"

—সাধক পলটু সাহেব

তোমরা কেউ উঁচু জাত বলে অহঙ্কার করো না। ভগবানের কাছে কেবল ভক্তিই আসল, তারই কদর বেশী।

একটা জুতার হাফ্‌সোল মারা হয়ে গেল। একেবারে যেন নতুন জুতা! কালি লাগায় আর ঘসে, যত ঘসে তত চক্‌চক্ করে!

রুইদাস চেয়ে চেয়ে দেখেন আর ভাবেন।

কি ভাবছেন রুইদাস?

ভাবছেন—এই দেহমনেও তো কত কালি জমে, তাই বলে কি এই দেহ ফেলে দিতে হবে ছেঁড়া জুতার স্তূপে? না। শ্রদ্ধা ভক্তির কালি দিয়ে একাগ্রতার ব্রাশ দিয়ে ঘস। দেখবে ঘসতে ঘসতে সব নতুন হয়ে গেছে!

ময়লা বালি মার্জনা না করলে তো মার্জনা ভিক্ষা করা যাবে না তাঁর কাছে।

তিনি যে পরম দয়াল! মার্জনা করাই তো তাঁর ধর্ম।

রুইদাস খাটছেন সঞ্চয়ের জন্য নয়। অপচয়ের জন্য।

সে অপচয় কি?

কাম, ক্রোধ ও লোভের অপচয়।

কিন্তু সঞ্চয় যারা করেন তাঁরা চিত্তকে বঞ্চনা করেন। সঞ্চয় করার বস্তু শুধু অর্থ নয়।

পরমার্থ সঞ্চয়ই হচ্ছে সঞ্চয়—কারণ সে অচ্যুত। এ ছাড়া আর তো সবই ক্ষয়।

এই ক্ষয়ের ঘরে আগুন জ্বালাতে হবে।

বেলা প্রায় যায় যায়। সেই সকালে এসে বসেছে ওর যেন ক্ষিধে তেষ্টা নেই।

রুইদাস তার যন্ত্রপাতি সব গুছিয়ে নিয়ে ঝোলানো থলেতে পুরে কাঁধে ফেলে সূর্যদেবতাকে প্রণাম করেন।

'জয় রামজী' বলে এবার যাত্রা শুরু করেন আস্তানার দিকে।

পথ দিয়ে মানুষ চলার বিরাম নেই—

সাধু বা ব্রাহ্মণ দেখলেই দূর থেকে তাঁদের প্রণাম করতে করতে অগ্রসর হন।

মনে মনে তাঁর রামনাম জপ লেগেই আছে। এ নামের ঢেউ তাঁর শিরা-উপশিরায় অবিরাম বয়ে চলেছে।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁর লাগবে কেন ?

দিনরাত যে রামনাম জপ করছে তাঁর তো সব কিছু ওতেই মিটছে।

বেলা গেল। জীবনের বেলা। জীবনের ফুলভরা গাছ থেকে একটা ফুল এবার ঝরে যাবে। এমনি করেই তো মানুষ সামনের পথে এগোচ্ছে। শুধু রুইদাস নয়।

এ দুনিয়ার সব মানুষ --

দিনের শেষে কে আর হিসাব মেলায় !

হিসাবের খাতা যাঁর কাছে, তিনি শুধু জমা খরচ করছেন।

ফাঁকি দেবে ?

কতদূর যাবে ?

অন্তরালে বসে একজন যে ফাঁকির হিসাব করছেন তা কি কেউ জানে ? জানে না।

রুইদাস চলেছেন আর সাধুসন্ত দেখলেই প্রণাম করেন। কেউ বলেন—বেটা চামারটার মাথা গোলমাল হয়েছে, নইলে অমন প্রণাম করতে করতে কেউ যায় ?

রুইদাস কোন দিকে তাকান না—কে কি বলে তাতেও কান দেন না।

তুলসীদাস বলেছেন—

'তুলসী জগমে আওকে সবসে মিলিও ধায়
না জানে কোন্ বেশমে নারায়ণ মিল যায়।'

সবার সঙ্গে মিলতে হবে এ দুনিয়ায়। কেউ অবহেলার পাত্র নয়। পাপ-তাপহারী নারায়ণ কখন যে কোন বেশে এসে সামনে দাঁড়াবেন তা কি কেউ বলতে পারে ?

রুইদাস বাড়ীর সামনে এসে দেখেন লছমী দাঁড়িয়ে আছে। রুইদাসকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে কাঁধ থেকে ঝোলাটা নিয়ে খাটিয়ায় বসিয়ে হাওয়া করে।

লছমী বলে, এত ভারী বোঝা কি করে তুমি বয়ে বেড়াও ?

রুইদাস হাসে, লছমী আমি শুধু একাই বই না, আরও একজন আমার কষ্টের ভাগ নেয়।

—সে আবার কি কথা ?

—কেন ?

—বারে ! বোঝা তো তোমার কাঁধে, তবে কষ্ট তো তোমারই !

একটু চুপ করে থেকে রুইদাস বলেন, না গো না, রামচন্দ্রজীও অর্ধেক কাঁধে নেন। তা যদি না হত, তাহলে একা কি আমি পারতাম। আমি তাঁকে দিনরাত ডাকছি। তাঁর জন্য কাঁদছি, আর তিনি চুপ করে বসে থাকবেন, এ কখনও হতে পারে ?

লছমী এবার হাওয়া থামিয়ে বলে—নাও, হাত পা ধুয়ে এস। কাপড় ছাড়। সন্ধ্যে হয়ে এল। আমি পূজার সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

—যাই লছমী। ভাবছি—

—কি আবার ভাবনা এল ?

—ভাবছি, বেশ দিন কাটছিল ভগবানের নাম করে। এর মধ্যে তোমাকে জড়িয়ে দিল আমার সাথে। শাস্ত্রে নাকি বলে স্ত্রী থাকলে সাধন-ভজনে অনেক বাধা পড়ে।

লছমীর মুখখানা ব্যথায় ভরে যায়। চোখ ছুটোতে জল ছল ছল করে।

রুইদাস বলেন, তোমার চোখে জল কেন ? আমি কি তোমাকে ব্যথা দিলাম ? হে ঠাকুর, আমার লছমীকে আমি কি ব্যথা দিলাম ?

কাপড়ের আঁচল দিয়ে লছমী চোখ মুছে ফেলল—আমি তো তোমার সাধন-ভজনে কোনদিন কোন বাধা সৃষ্টি করিনি—আমার মত ভাগ্যবতী কাশীর মহারানীও নয় !

—চুপ, লছমী ! কেউ শুনে ফেলবে ! মুচির বৌ আবার ভাগ্যবতী কবে হয়েছে ?

—কেন, এই যুগে ? তোমার মত ধার্মিক ন্যায়পরায়ণ দেব-দ্বিজে ভক্তিমান যার স্বামী, সে ভাগ্যবতী নয় ? বড় আনন্দ আমার, বড় সুখ আমার—আমাকে তুমি একবেলা খেতে দিও, তবুও আমায় আর ও কথা বোল না গো ! আমি যে বড় আশা নিয়ে বসে আছি।

—কি আশা নিয়ে বসে আছ লছমী ? তোমার এই ঘর ইটের হবে ? তোমার গা ভরতি সোনার গয়না হবে ? ভাল মন্দ খাবে ? তোমার দাস-দাসী হবে এই আশায় তুমি বসে আছ ?

লছমীর মুখ এক নিমিষেই বিষাদে ছেয়ে গেল।

এবার বালকের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগল।

একটু থেমে বলল—ওগো, ও আশা নিয়ে আমি বসে নেই। আমি বসে আছি সেই আশায় যেদিন রামচন্দ্র তোমাকে কৃপা করবেন, তোমাকে দর্শন দেবেন, আমিও সেদিন তোমার চরণতলে বসে তাঁর দর্শন পাবো, তাঁর কৃপা পাবো। আমার জনম সার্থক হবে। এর চেয়ে বড় আশা আমার নেই। আমি তোমার কাছে গয়না চাইনে, বাড়ীও চাইনে, তোমার পায়ের নীচে পড়ে থাকতে চাই। বল, ঐ আশ্রয় থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেবে না ?

রুইদাস তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, তাই হবে লছমী। তুমি আমায় সাহায্য কর। এ জনমে যদি ডাকতে ডাকতে আমার কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে যায়, তুমি তাঁকে ডেক। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে যদি আমার চোখ অন্ধ হয়ে যায়, তুমি তোমার চোখ দিয়ে আমাকে দেখিও। চল লছমী—সন্ধ্যা হয়ে এল। আজ সেই ভজনটা গাইতে হবে যেটা কদিন আগে বানিয়েছি।

গঙ্গার ঘাটে ধীরে ধীরে সন্ধ্যে নামে।

জলের ওপর নৌকায় মাঝিরা প্রদীপ জ্বালায়।

রুইদাস ভগবান রামচন্দ্রের সামনে বসে পূজা শুরু করেন। লছমী ধূপ-দীপ জ্বালে।

বিচিত্র মানুষের সংসার।

আরও বিচিত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ইতিহাস। কেউ গহনা না হলে মুখ ভার করে থাকে, কেউ অট্টালিকায় বাস করতে না পেরে নিজের জীবনকে ধিক্কার দেয়। অগ্নি সাক্ষী করে যে মানুষটাকে স্বামীত্বে বরণ করেছে তাকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেয়।

আবার এই মানুষের সংসারে দেখা যায় কেউ গহনা না পেয়ে হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছে। গোলপাতার ঘরে স্বামীকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করছে। কেউ শাড়ী না পেয়ে বাপের বাড়ী চলে যাচ্ছে। কেউ ছেঁড়া শাড়ী সেলাই করে পরে স্বামীর বাড়ীতে স্বর্গ রচনা করছে।

একই মানুষের কত রূপ!

স্বামী কে?

আমার আমিত্বকে ঘুচিয়ে দিয়ে যিনি তুমির মধ্যে বিলীন হন তিনিই তো স্বামী।

আমি কে!

আমি কেউ নয়—সবই তুমি। তুমি না থাকলে আমি নেই। তুমিই আমার জগৎস্বামী!

তোমার মাঝে আমার রামচন্দ্রজী। তোমার মাঝেই আমার নারায়ণ।

এই ভাব যার আছে তার মত সুখী কে আছে?

তাই লছমী মুচির বৌ হয়েও কাশীর রানীর চেয়েও সুখী। পূজা শেষ করে রুইদাস বাইরে এসে বলে, লছমী, তুমি বড় ভাগ্যবতী। রামজী অবশ্যই তোমাকে কৃপা করবেন।

লছমী রুইদাসের দিকে চেয়ে বলে—ওগো, তিনি আমাকে কৃপা করেছেন—বড় আনন্দ আমার। আমি যে নিত্য তাঁর চরণ দর্শন করি। তিনি আমায় আশীর্বাদ করেন।

রুইদাস চমকে যান!

বলে কি লছমী! সে নিত্য রামচন্দ্রের দর্শন পায়! হতে পারে—ভক্তিতে ভগবান মেলে।

এ চার যুগের কথা। ভক্তি ছাড়া মুক্তি নেই।

বই পুঁথিতে দেখতে পাই যাঁরা ভগবান দর্শন করেছেন তাঁরা এক একটা ভক্তির পাহাড়। হ্যাঁ, লছমীর ভক্তিতে হয়ত রামজী তাকে দর্শন দিয়েছেন।

বড় আনন্দ রুইদাসের। সারা দেহমনে অব্যক্ত সুখের স্রোত ঝরে চলেছে। ভাগ্যবতী লছমী রামচন্দ্রের আর্শীর্বাদ পেয়েছেন। আনন্দে যেন নৃত্য করতে থাকেন।

পরে বলেন—লছমী বড় দুঃখী জানি, তিনি আমাকে কৃপা করলেন না।

—হ্যাঁগা, দেখাবে তোমার রামচন্দ্রকে?

—হ্যাঁ! দিনরাত আমি দেখছি আর তোমাকে আমি একবার দেখাতে পারব না? বসো ঐ খাটিয়াতে আমি দেখাচ্ছি।

রুইদাস খাটিয়ায় বসলেন—

লছমী রামচন্দ্রের প্রসাদী মালা তাঁর গলায় দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে বললে—এই দেখ আমার রামচন্দ্র, আর ঐ দেখ তোমার রামচন্দ্র—এই দুই আমার কাছে এক।

রুইদাস আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেয়ে উঠলেন—

"ভজরে মন রামনাম নিশিদিন
রামনাম নিশিদিন
রাম ভজন বিনা কুছু নাহি জগমে
বল মুখ সদা রাম রাম।
সাংসার সুখ সায়কি বন্ধন
সভি হৈ মন দুঃখ কি কারণ

রাম ভজমে সব সুখ আওয়ে
পাওয়ে সন্তোষ ধন।”

রুইদাস গান থামিয়ে লছমীকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—লছমী, তোমার বড় কষ্ট! কেন তুমি কষ্ট করতে আমার ঘরে এলে?

লছমী রুইদাসের কোলে মাথা রেখে বলেন—কেমন করে রামজীকে ডাকতে হয়, তাই শিখতেই তো তোমার কাছে এলাম। রামনাম করতে করতে খুরপাইয়ের ওপর মাথা রেখে কত তুমি কেঁদেছ। সবাই তোমাকে ঠকিয়েছে, তবুও তুমি কাউকে প্রবঞ্চনা করনি। তোমার হাতের সেলাই করা জুতা দিয়ে কত জনে তোমায় মেরেছে, তুমি তাদের একটা কথাও বলনি। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তুমি শুধু রঘুনাথকে ডেকেছ। ডেকে ক্লান্ত হবে বলেই তো আমি এলাম। দুজনে তাঁকে ডাকব, দুজনে একসঙ্গে চার চোখের জল ফেলব তবুও কি তাঁর দয়া হবে না?

—হবে, লছমী হবে! আমাদের দুজনের ডাকে দয়াল ঠাকুর সাড়া না দিয়ে পারবেন না!

ভক্ত রুইদাস! সাধক রুইদাস!

তুমি তো জান না, ভগবান রামচন্দ্র তোমার হৃদয়-মন্দিরে প্রদীপ হয়ে জ্বলছেন! তুমি কাঁদলে তিনিও কাঁদছেন! তোমার চোখের জলে নদী বয়ে যাচ্ছে, আর তাঁর চোখের জলে সাগর সৃষ্টি হচ্ছে।

তোমার যে নিত্য অবগাহন স্নান হচ্ছে সেই সাগরের জলে।

ডুবে যাও রুইদাস, অতল তলে তলিয়ে যাও। মনি মুক্তা যে সেখানেই আছে।

ডাঙ্গায় বলে ডুব দেওয়া যাবে না?

জলে নামো, আরও নামো, ডুবে যাও অতলে।

ভক্ত রুইদাস নিত্য সেই ছাতিমতলায় বসে জুতা সেলাই করেন। তাঁর যা দরকার তার বেশী রোজগার হলেই তিনি তা সাধুসন্তদের দিয়ে দেন অথবা কোন সাধুসন্তকে সাথে করে ঘরে নিয়ে এনে তাঁর

সেবা-যত্ন করেন। রামনাম তাঁর সদা মুখে। খোদ্দেরের সাথে কথা বলতে-বলতেও রামনাম ভুল হয় না।

আপন মনে সেলাই করতে করতে বলে উঠেন—ঠাকুর! গতজন্মে যে ভুল করেছি সবই আমার মনে আছে। গুরুর শাপে চামারের ঘরে জন্মেছি, তাতেও আমার কোন দুঃখ নেই। শুধু এইটুকু কৃপা চাই আমি যেন আর ভুল পথে না যাই। বড় শান্তি আমার, আমি ভগবানের নাম করতে পারছি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমি যেন নাম করতে পারি!

—আরে তোর আক্কেলটা কিরে? চামড়াটা সরা পথ থেকে। আমি যাচ্ছি গঙ্গা মাকে এই ফুল দিতে—এ ফুলগুলো অপবিত্র করে দিসনে।

রুইদাস দেখলেন এক ব্রাহ্মণ চলেছেন গঙ্গায়।

তিনি করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে চামড়াটা সরিয়ে নিয়ে বললেন—বাবা, মাপ করুন—আমার একটা উপকার করবেন?

—কি রে!

—আমি দুটো ফুল দিচ্ছি আমার নাম করে মা গঙ্গাকে দেবেন?

ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করছেন—তাইত বেটা মুচি ওর সাহস তো কম নয়! আমার হাতে ও ফুল দিতে চায়!

রুইদাস বুঝতে পারেন ব্রাহ্মণের মনের কথা। তিনি বললেন, বাবা কোন চিন্তা নেই। আমি নিত্য গঙ্গাস্নান করেই এখানে বসি। এতটুকু অপবিত্র আমি নই।

—দে বেটা ফুল!

তাইতো ফুল কোথায়? এখানে তো ফুল নেই! তবে কি দেবেন তিনি?

কিছুদূরে দেখলেন ছোট একটা জংগলের মধ্যে কতকগুলো জংলা ফুল ফুটে আছে। দুটো ফুল তুলে এনে ব্রাহ্মণের হাতে দিতেই ব্রাহ্মণ বললেন—দূর বেটা, এ ফুলে কি পুজো হয়?

—হবে বাবা! ভক্তিই তো আসল। ওতেই মা গঙ্গা সন্তুষ্ট হবেন। আপনি নিশ্চিন্তে আমার নাম করে গঙ্গায় দেবেন, তিনি অবশ্যই গ্রহণ করবেন। তিনি যে সবার মা। ছোট জাত, বড় জাত সবাই তো তাঁর সন্তান।

ব্রাহ্মণ তখন গঙ্গার পথে হাঁটা ধরেছেন।

রুইদাস জয় রাম জয় রাম বলে জুতো সেলাই করেন। খুরপাই-য়ের ওপর জুতা রেখে হাতুড়ি দিয়ে পেরেক বসান।

রুইদাস হঠাৎ আপন মনে হেসে ওঠেন।

একটা খদ্দের বলে ওঠে—কি ভাই হাসছ কেন! জুতাটা আমি বেশ দাম দিয়েই কিনেছিলাম। শালা দু'বছর গেলনা—ঠিক মানুষের মত আজকে জ্বর, কাল কাশি, পরশু মাথাব্যথা।

—তার মানে?

—বুঝলে না! আজ তলা খসে গেল। কাল চামড়া ছিঁড়ে গেল। পরশু পেরেক উঠল—

রুইদাস হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠেন—বুঝলেন রঘুনাথজীর কি সৃষ্টি এই পেট। আমি সাত সকালে এই ছেঁড়া জুতো নিয়ে বসি এই পেটের জন্য। আপনি এই পেটের জন্য দোকান পেতেছেন, আর ভদ্দর লোকেরা লেখাপড়ার কাজ করছেন এই পেটের জন্য। এই পেটের জন্যই তো মাথা হেঁট। মাথা নীচু কি কেউ ভগবানের জন্য করে? করেনা—মজাদার দুনিয়া!

ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করে গঙ্গায় তাঁর ফুল দিলেন। রুইদাসের দেওয়া ফুল আর দিলেন না। ভাবলেন চামারের দেওয়া ফুল গঙ্গায় দিয়ে তিনি কি পাপের ভাগী হবেন?

অনেকটা পথ এসে তিনি ভাবলেন—অবিশ্বাসী হওয়া ঠিক নয়। মুচিটা বিশ্বাস করে দিয়েছে যখন দিয়ে আসি গঙ্গার জলে।

ব্রাহ্মণ আবার ফিরলেন।

গঙ্গার ধারে এসে তিনি মনে মনে বললেন—গঙ্গামা! এই ফুল দুটো রুইদাস দিয়েছে, এই নাও।

এই বলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফেলে দিলেন গঙ্গার জলে। ব্রাহ্মণ অবাক বিস্ময়ে দেখলেন যে, জলের ওপর দুটো কাঁকন পরা হাত ভেসে উঠে ফুল দুটো গ্রহণ করল।

ব্রাহ্মণ হাত জোড় করে প্রণাম করে আপন মনে বললেন—ধন্য রুইদাস তোর ভক্তি!

ব্রাহ্মণ ফিরলেন।

রুইদাস বসে আছেন।

ব্রাহ্মণকে দেখতে পেয়ে বললেন—কেমন বাবা, বলেছিলাম না ভক্তিই আসল এই ভক্তি যার আছে তার কাছে ভগবান তো বাঁধা।

—হ্যাঁ রুইদাস, ঠিক বলেছ। আমি নিজচক্ষে দেখেছি দুটো হাত তোমার ফুল দুটো গ্রহণ করল।

রুইদাস কাজ ফেলে উঠে দাঁড়াল—সত্যি বলছ বাবা। কি ভাগ্য আমার। ফুল নিয়েছে! তোমার চোখ দুটো ধন্য হল।

ব্রাহ্মণ খুশী মনে পথ বেয়ে চলে গেলেন।

রুইদাস কাঁদছেন।

এ চোখে শুধু জলই ঝরায়।

আর কিছু পারে না।

যে চোখ ভগবান দর্শন করেনা সে চোখ থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি, যে কান ভগবানের নাম শোনেনা সে কান বধিরহওয়া ভাল, আর যে মুখ ভগবানের নাম করে না সে মুখ মুক হয়ে যাক।

রুইদাসের বাড়তি রোজগারের পয়সা বাবা মা চোখে দেখতে পাননা কারণ তিনি তা সাধু সন্তদের দিয়ে আসেন আর না হয়

তাদের এনে সেবা যত্ন করেন।

বাবা ও মা এটা বরদাস্ত করতে পারেন না। ভবিষ্যৎ ভাবে না ছেলেটা। বাড়তি পয়সা জমিয়ে তো ভাল একটা ঘর হতে পারে। কত কষ্টের সংসার—এটা জোটে তো ওটা জোটে না। বৌটা রয়েছে, তারও তো একটা ভাল কাপড় হতে পারে। আজ দু'জন আছে কাল তো বাচ্চা-কাচ্চা হতে পারে, সে কথা চিন্তা করে না। তার চেয়ে ও ওর মত থাকুক—যা ইচ্ছে করুক।

একদিন সন্ধ্যার আগে রুইদাস এলে বাবা তাঁকে বললেন, হ্যাঁরে আজকের বাড়তি পয়সা কাকে দিয়ে এলি?

রুইদাস আনন্দের সংগে জবাব দেন, আজও এক সাধু সেবায় দান করেছি বাবা।

বাবা ক্রোধে ফেটে পড়লেন—বেটা চামার না হলে এ কাজ কে করবে। নিজের সংসারে কত কষ্ট। পেট ভরে খাওয়া জোটে না, তার এত কেন!

রুইদাস জবাব দেন—বাবা! আমরা তো খেয়েই থাকি। বাড়তি পয়সা দিয়ে সাধুসেবায় দোষ কোথায়?

—চুপ! যে বাপ-মার সেবা করতে জানে না তার সাধুসেবায় কোন কাজ হবে না। তুই কাল থেকে ঐ যে খালি জায়গাটা আছে ঐ খানেই ঘর বেঁধে আলাদা থাক।

রুইদাস মাথা নীচু করে বললেন, তাই হবে বাবা। আপনি আশীর্বাদ করুন রঘুনাথজীর কৃপা যেন আমি পাই।

বাবা রাগে গর্জাতে থাকেন—মুচির কাজ চামড়া নিয়ে। একটা মুচির জন্য, ভগবানের আর খেয়ে কাজ নেই যে তিনি কৃপা করবেন। চামড়ার গন্ধ যার নাকে লেগে আছে জন্ম থেকে, সে ফুলের গন্ধ পাবে কি করে?

রুইদাস মনে মনে হাসে -

কোন দুঃখ তার নেই।

রামজীর যদি তাই ইচ্ছে হয় আলাদা একটা ছাপড়া করেই তাতে থাকবেন স্বামী-স্ত্রীতে। ঐখানেই তাঁরা ভগবানের নাম করবেন। খাওয়া যদি না জোটে না জুটবে। রামনামে কি অর্ধেক পেটও তাঁদের ভরবে না? নিশ্চয়ই ভরবে।

"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি রাম ভজে।
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি রাম ত্যাজে।"

রুইদাস ভক্ত। রুইদাস সাধক। মন্ত্র জানেন না। তন্ত্র জানেন না। শাস্ত্র পাঠ করেন না অথচ সে শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি শুধু রাম নাম ও সাধুসঙ্গ করেন। ভগবানকে পেতে হলে এই যথেষ্ট।

তাই রুইদাস আর তাঁর স্ত্রী দিনরাত এই নামমধু পান করে বিভোর হয়ে থাকেন। সাধুসন্ত এলে সেবা যত্ন করেন।

ভক্তের জন্য ভগবান কাঁদেন। শুধু ভক্তই কাঁদে না।

একদিন সাধুর বেশে ভগবান এলেন রুইদাসের ঘরে। সাধুর পায়ে একটা ছেঁড়া চপ্পল।

রুইদাস যত্ন করে বসিয়ে বলেন—ঠাকুর! দাও তোমার চপ্পলটা সেলাই করে দিই।

চপ্পলটা হাতে করে রুইদাস বলেন—এতে এত মিষ্টি গন্ধ আসছে কেন?

—দূর বেটা চপ্পল কি মিষ্টি দিয়ে তৈরী যে গন্ধ আসবে মিষ্টির।

সাধু দেখছেন চারিদিক চেয়ে—মাথার ছাউনিটা তেমন নয়। জুতো সেলাই করে কি আর ঘর মেরামত করা যায়। পেটের ভাতই জোটে না।

রুইদাস বললেন, অমন করে কি দেখছ?

—তোর বড় কষ্ট! ভগবানের কি বিচার! যে দিবারাত্র

তাঁর নাম করছে তার কপালে এত দুঃখ।

তুমি কি করে জানলে যে আমার খুব কষ্টে দিন যায়?

—জানি বইকি।

—কেমন করে জানলে? তুমি কি আমাকে চেনো নাকি?

—না চিনলে আর জানলাম কি করে? তবে রঘুনাথ তোকে দর্শন দেবে!

—দেবেন? আমাকে দর্শন দেবেন—এই ছোটজাত মুচিকে তিনি দর্শন দেবেন তাঁর জাত যাবে না?

—দূর বেটা। ভগবানের আবার জাত আছে নাকি? তিনি যে ভক্তের ভগবান। জানিসনে ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে কোলে নিয়েছিলেন।

—তাই নাকি? তাহলে আমি তাঁকে দেখতে পাব? আমাকে তিনি কৃপা করবেন?

রুইদাস আনন্দে নৃত্য করতে থাকেন।

লছমী অবাক বিস্ময়ে এ দৃশ্য দেখেন।

ছদ্মবেশী ভগবান রুইদাসের ভক্তিতে বাঁধা পড়েছেন। এত কষ্ট দেখে রুইদাসের তাঁর মনে প্রাণে কাঁটার মত বিঁধছে। তিনি রুইদাসকে একটা পাথর দিয়ে বললেন, এই নে চপ্পল সারানোর দাম।

—ওটা কি?

—পরশমণি পাথর, যাতে ছোঁয়াবি তাই সোনা হয়ে যাবে। সেই সোনা বেচে ঘর বাঁধবি। মনের আনন্দে থাকবি। সুখে থাকবি। বৌয়ের গহনা গড়িয়ে দিবি।

রুইদাস চমকে ওঠেন। কি সর্বনাশ! আমার খুরপাই, আমার যন্ত্রে ছোঁয়ালে সব সোনা হয়ে যাবে!

হ্যাঁরে! পরখ করে দেখনা। হয় কি না?

—না আমার পরখ করে আর কাজ নেই। তোমার জিনিষ

তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও ঠাকুর, ওতে আমার কাজ নেই। যে পাথরে আমার রামজীকে পাওয়া যাবেনা সে পাথর আমি চাইনা। আমি রামধন চাই। সোনাদানা টাকাপয়সা আমার কোন কাজে লাগবে না।

একটু থেমে রুইদাস চোখের জল মোছেন এ কি বিপদে ফেললে ঠাকুর। যা আমি চাই না তাই নিয়ে সাধাসাধি করছ। যা আমি চাই তা কেউ দেয় না।

—কেনরে ঘর মেরামত করবি না ?

—করব ঠাকুর সে এ ঘর। আমার মনের ঘর, আমার হৃদয়ের ঘর মেরামত করব। উনি যদি কোনদিন আসেন তাহলে এই ভাঙা ঘরে তাঁকে কি করে বসাব ? কিন্তু ভক্তির দড়ি আর প্রেমের খড়কুটো যদি দাও নিতে পারি।

সাধুরূপী ছদ্মবেশী ভগবান মনে মনে হাসছেন। পরে বললেন, বেশত, এখন না হয় রাখ ফেরবার সময় নিয়ে যাব।

তুমি যেখানে রাখবে রেখে যাও। আমি ওতে হাত দেবো না। কিন্তু ফিরবে কোথা থেকে ?

আমি তীর্থে চলেছি। এ জিনিস যেখানে সেখানে দেওয়া যায় না।

—ঠিক আছে, তুমি রাখ আবার তুমিই নিয়ে যেও।

সাধু সারান চপ্পল পরে আবার পথ ধরলেন।

রুইদাস কার উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন বার বার—ঠাকুর! আমাকে এত পরীক্ষা করছ কেন ? আমি তোমাকে ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কোন ঐশ্বর্য চাই না। তুমি এলে আমার সব পাওয়া হবে।

লছমী শাঁখ বাজায়।

রুইদাস বলে, বাজা লছমী জোরে বাজা। ঘর মেরামত করতে হবে। রঘুনাথজী এলে কোথায় বসাব? জয় রঘুনাথ! জয় রঘুনাথ!

দীর্ঘ তেরমাস কেটে গেল। রুইদাস তেমনি ভাবে দিন কাটান। সাধুর ছদ্মবেশে ভগবান তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছেন। বলে গেছেন যে তিনি ফেরার সময় তাঁর জিনিস নিয়ে যাবেন।

কলিযুগে অর্থ কে না চায়? দুঃখী মানুষ অর্থ পেলে কি লোভ সামলাতে পারে? পারে না। রুইদাস নিশ্চয়ই এতদিন সবকিছু পাল্টে ফেলেছেন। তার ঘর বাড়ীর রূপও নিশ্চয়ই পাল্টে গেছে।

কিন্তু রুইদাসের যে আঁধার, সেই আঁধারেই তিনি দিন কাটাচ্ছেন। এক চিন্তায় যাঁর দিনরাত কাটছে, তিনি দ্বিতীয় চিন্তা কি করে করবেন। পরমার্থ নিয়ে যিনি নাড়াচাড়া করছেন তিনি অর্থের কথা ভাববেন কখন?

এই সময় সাধু তীর্থ থেকে ফিরলেন। রুইদাস তাঁকে খুব সেবা যত্ন করলেন।

সাধু বললেন, ঐ পাথর দিয়ে কি করলে এতদিন, বোকা অনেক দেখেছি কিন্তু তোমার মত এইরকম বোকা আমি দেখিনি। ভেবেছিলাম, তুমি তোমার অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছ। কি করলে সে পাথর?

—বাবা যেখানে রেখে গেছেন সেখানেই আছে—আমি ওতে হাত দিইনি। ওতে আমার বড় ভয়। ঐ পাথর আমি হাতে নিলে রামজীকে ভুলে যেতাম।

সাধু হাসছেন।

এমন ভক্তি না হ'লে ভগবান তার দোরে আসে? কলির মানুষ আজ শোকে তাপে জর্জরিত। দুঃখকষ্টের বাতায়নে বসে তাদের দিনরাত কেটে যাচ্ছে। তাদের মন থেকে প্রেম ভালবাসা অন্তর্হিত হয়েছে।

যাঁর কথা ভাবলে আর কারও কথা ভাবতে হয়না, তাঁর কথা এবার বিস্মরণ হয়েছে।

ভগবানকে ভুলেই মানুষের এই বিপর্য্যয়!

রুইদাস হাতজোড় করে বলছেন—ঠাকুর আমাকে আর কত পরীক্ষা করবে? সারাজীবন কি শুধু পরীক্ষা দিয়েই যাব? না বললে কি জানাবে না?

সাধু চলে যাচ্ছেন।

রুইদাস তাঁর দু'পা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আশীর্বাদ করুন যেন রামজী আমাকে কৃপা করেন।

সাধু বললেন—সময় হলে ঠিক তিনি কৃপা করবেন রুইদাস। তোমার জন্য তাঁরও ভাবনার শেষ নেই!

—আমার জন্য তিনি ভাবেন?

—নিশ্চয়ই ভাবেন। শুধু জমিদার হয়ে জমিদারি চালালেই চলে না, প্রজার কথাও তো ভাবতে হয়।

সাধু চলে গেলেন।

রুইদাস ডাক দেন—লছমী! লছমী!

—বলো! এই তো আমি?

—ঠাকুর বলে গেলো রামজী আমাকে কৃপা করবেন

—এ জনমে কি হবে?

—কে জানে!

রুইদাস একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান। ঠাকুরের দিকে চেয়ে তাঁর চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

—তুমি কাঁদছো গো! কেন?

—এ কান্না আমার নতুন নয়। জনম ভোরই তো কাঁদছি। এ কান্নার শেষ হবে না।

লছমী কোন কথা বলেনা। রুইদাস চোখের জল মুছে বলেন আমার জন্য তোমার জীবনটা মাটি হ'য়ে গেল। কোথায় তোমার সুখ। একটা ভাল কাপড় তোমার নেই। দু'বেলা দুটো পেট ভরে খেতে পাও না। তোমার মত দুঃখী আর কে আছে?

—ও কথা বোল না। দিন এরকম থাকবে না। আজ দুঃখে দিন কাটছে, কাল হয়ত সুখ হবে। তাছাড়া আমি তো বড় সুখেই দিন কাটাচ্ছি—তোমার সাথে রামজীর ভজনা করছি। এ ভাগ্য ক'জনের হয়।

রুইদাস আর কিছু বলেন না। লছমীর হাসিমাখা মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। দুঃখের বাজারে বসে যে হাসি সওদা করতে পারে সেই তো সুখী!

এই জগত-সংসারে সুখ-দুঃখের আড়তে যিনি বসে আছেন, তিনি ওজন করেই তা দিয়ে থাকেন।

"জৈসে সাঁড়াশী লোহকী
ছিন পানি ছিন আগ।
তৈসে সুখ-দুঃখ জগৎকে সহজো তু তজভাগ॥"
—শহজীবাঈ

কামারের লোহার সাঁড়াশী যেমন একবার আগুনে একবার জলে নিমগ্ন হয় তেমনি জগতের সুখ দুঃখ। এই সুখ, এই দুঃখ। জগৎ ত্যাগ করে পালাতে পারলেই মঙ্গল।

সুখ আর দুঃখ।

দুঃখ আর সুখ।

প্রতিটি মানুষের জীবনে কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে আছে। শুধু জড়াতে জানলেই চলবে না। ছাড়ানোর পথও জানতে হবে।

রুইদাস দুঃখের ঘরে রামনামের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। তিনি বোধাতীত। কোনটা সুখ কোনটা দুঃখ তা তিনি অনুভব করতেই যেন পারেন না।

রুইদাস প্রতিদিন সকালে রামজীর পুজোর জায়গা পরিষ্কার করেন। আসন ঝেড়ে আবার পাতেন।

একদিন আসন ঝাড়তে গিয়ে দেখতে পান পাঁচটা মোহর রয়েছে। তাঁর মন এত ভারাক্রান্ত হ'য়ে যায় যে তিনি সেখানে বসে পড়েন। না হল না। তিনি এ জায়গা ছেড়ে পালাবেন। এমন জায়গায় তিনি চলে যাবেন যেখানে কোন সোনা-দানা নেই, মোহর নেই। যা তিনি চান না তাই তাঁকে ঘিরে ধরছে। রামজীর কি ইচ্ছা তা কে জানে!

কিন্তু প্রতিদিনই আসনের তলায় পাঁচটা করে মোহর পান। এ কি কাণ্ড! কোথা থেকে এ মোহর আসছে। কে রেখে যাচ্ছে? পর পর তিনদিন তিনি মোহর পেলেন।

এ ক'দিন তার বড় চিন্তায় দিন যাচ্ছে। নিত্যই তিনি তাঁর ঝোলা নিয়ে ছাতিম তলায় জুতো সারতে বসেন কিন্তু মন বড় উদভ্রান্ত হ'য়েছে। এখানে থেকে তিনি আর মোহর কুড়াতে পারবেন না। চলে যাবেন বহুদূরে।

তৃতীয় দিনে তিনি মনস্থ করলেন পরদিন প্রভাতেই এ জায়গা ছেড়ে বহুদূরে চলে যাবেন।

সেই রাতে ভগবান স্বপ্নে বললেন—রুইদাস মোহরে তোমার এত ভয় কেন? তুমি সুখে থাক এই আমি চাই। তুমি দুঃখ পেলে আমিও দুঃখ পাই। তোমার চোখের জলে আমারও চোখের জল পড়ে। তুমি আমি তো আলাদা নয়। তোমাকে ঐ মোহর দিয়ে এক মন্দির তৈরী করতে হবে। নিত্য পূজা হবে।

ভোগরান্না হবে। ভক্তরা আসবে। নাম গান হবে। এই মোহর দিয়েই তো তোমাকে করতে হবে। সব যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন আর মোহর পাবে না।

রুইদাসের জীবনে এ আবার এক নতুন পরীক্ষা।

এতবড় কাজ তিনি কি ভাবে করবেন ভেবেই পান না। একে লেখাপড়া জানেন না, পাটোয়ারী বুদ্ধিরও তাঁর বড় অভাব। এতবড় কঠিন কাজ কি তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে?

লছমী স্বামীকে সান্ত্বনা দেয় তুমি ভাবছ কেন? মনিবের আদেশ! যা বলছেন তাই কর, তুমি তো ভৃত্য।

রুইদাস বলে ওঠেন, ঠিক বলেছ আমি ভৃত্য। নির্দেশ পালন করাই তো ভৃত্যের ধর্ম।

আমি করলাম। তুমি করলে। সে করল।

এই তো কলির মানুষের কথা!

কিন্তু অলক্ষ্যে বসে যিনি করাচ্ছেন তাঁর কথা তো কেউ জানে না। কেউ ভাবে না।

যে ভাবতে জানে সে পার হয়ে যায়।

মানুষ মানুষের বড় সহায় নয়।

ভগবানই একমাত্র সহায়। একমাত্র বল।

মানুষের কোন ক্ষমতাই নেই। ভগবান যা করেন তাই হবে। এই ধারণা যদি কারও দেহেমনে শিকড় পোঁতে তাহলে সব কাজেই তার জয় অনিবার্য্য।

শোক, তাপ, দুঃখ কষ্টের সংসারে এই ঘা খাওয়া ক্ষতবিক্ষত মানুষের মনে বিশ্বাস যেন কর্পূরের মত উড়ে গেছে।

ভগবানে বিশ্বাস আনতে গেলে আশ্বাসের প্রয়োজন।

সে আশ্বাস কে দেবে?

দেবে সাধু-সন্ত। দেবে গুরু।

ভাবতে হবে জানতে হবে যে আমি একা নয়, আমার ভিতরে

একজন আছেন তিনি আমাকে চালাচ্ছেন।

ভক্ত রুইদাস বুঝেছেন সে কথা। তাঁর সাধন ভজন দিয়ে তিনি চিনেছেন সেই পরম দয়ালকে। তাই বনের ফুল মা গঙ্গা গ্রহণ করলেন দু'হাত বাড়িয়ে। তাই আসনের নীচে মোহর হেঁটে আসে। তাই স্বপ্নে তিনি দেখা পান দয়াল ঠাকুরের। তিনি বুঝেছেন এ জগৎ-সংসারে আসল বলতে কিছুই নেই। নকল দিয়ে জগৎ ঘেরা। মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী কত আপন। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

তা নয়! ঐ যে অট্টালিকা, ঐ যে ঐশ্বর্য্য, ঐ যে ধনদৌলত ও তো কাল নাও থকেতে পারে।

তবে থাকবে কি?

থাকবে সেই নিত্যবস্তু ভগবান। যা চিরকাল ছিল। আছে ও থাকবে। রুইদাস পেয়েছেন সেই নিত্যবস্তুর সন্ধান।

রুইদাস মন্দির তৈরী করলেন।

নিজে অধ্যক্ষ হলেন সেই মন্দিরের।

অপরূপ এক হরিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। নিত্যপূজা, কীর্ত্তন, ভোগরাগ আরতিতে মন্দির গম্ গম্ করে।

দাসানুদাস রুইদাস যে কেউ আসলেই তাঁকে ভক্তিভাবে প্রণাম করে মন্দিরে আহ্বান করেন।

প্রতি সন্ধ্যায় আরতির সময় লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় মন্দির। মন্দিরের দেবতার অপরূপ সাজ। ধূপধুনোর গন্ধে চারিদিক আনন্দিত। রুইদাস আনন্দে হাততালি দিয়ে নৃত্য করেন।

আরতির পর ভোগরাগ, তারপর প্রসাদ বিতরণ। রুইদাস নিজ

হাতে সকলকে প্রসাদ দেন।

কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র, কে উচ্চ, কে নীচ, কে তার সন্ধান রাখে। দেবতার প্রসাদ নেবে, সেখানে আবার জাত কিসের?

জাত! জাত! জাত! যত সব বজ্জাতের কারখানা। ভগবানের কি জাত তা কি কেউ জানে? মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ মানুষের সংসারে ছাড়া আর কোথাও নেই। মানুষকে ভালবাসতে না জেনে এরা দেবতাকে সরিয়ে দিয়েছে দূরে। মানুষকে আপন করতে না জেনে এরা দেবতাকে করেছে পর। মানুষের মন হয়েছে বন্য, তাই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্বেষ হিংসার অস্ত্র নিয়ে মানুষের মনে আঘাত হানতে।

ব্রাহ্মণরা রাজার কাছে নালিশ জানালেন রুইদাসের বিরুদ্ধে। অভিযোগ করলেন যে চর্মকার হয়ে সে দেবতার পূজায় রত। মন্দিরে শালগ্রাম শিলার মাথায় সে নিত্য জল-তুলসী দেয়। চর্মকারের হাতে দেবতার প্রসাদ বিলি হয় সর্বস্তরের সকল মানুষের মধ্যে। সবাইকে সে জাতিচ্যুত করার মতলব এঁটেছে। পূজা-অর্চনা যাগ-যজ্ঞ এসব তো ব্রাহ্মণের অধিকার। রুইদাস অস্পৃশ্য, তার মন্দিরে কোন প্রবেশাধিকার নেই। এ অনাচার দেশ ও দশের ক্ষতি করবে যদি এক্ষুণি এর কোন বিহিত না করা যায়।

রুইদাসের কানে পৌঁছল এ সংবাদ।

এতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না।

ঈশ্বরের পূজায় শুধু ব্রাহ্মণের অধিকার? মিথ্যা কথা—দেবতা কারোর ক্রয় করা জিনিষ নয়। তিনি তো সকলের। তিনি যে জগৎপিতা। সকলকেই তিনি সন্তানবৎ স্নেহ করেন। তাঁর ভজনা করবার অধিকার সকলেরই আছে। সবার ডাকেই তিনি

সাড়া দেন। সবার প্রেমেই তিনি মসগুল।

রাজাদেশে রাজপুরুষেরা রাজার আদেশনামা নিয়ে মন্দিরে হাজির হল।

রুইদাস তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

রাজপুরুষেরা রাজাদেশ জানালেন যে শালগ্রাম শিলাসহ তাঁকে রাজবাড়ী যেতে হবে।

রুইদাস হাসলেন। ব্রাহ্মণদের অভিযোগে তাঁকে নারায়ণকে নিয়ে যেতে হবে রাজবাড়ীতে।

ঠাকুর তোমার চমৎকার লীলা!

ব্রাহ্মণ কারা?

এক সাধক বলেছিলেন:

"ব্রাহ্মণ ভয়া তা ক্যা ভয়া
গলে লপেটে সূত।
ধ্যান ধরমকা মরম না জানে
যেইসা জংলী ভূত।"

এমন ব্রাহ্মণ যে দেশে আছে সে দেশে দেবতাকে বন্দী হতে হয়।

রুইদাস 'জয় রাম' 'জয় রাম' ধ্বনি দিতে দিতে শালগ্রাম শিলা বুকে করে রাজবাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

সকালের রোদে পথঘাট ভেসে গেছে। দু'চারজন লোক যারা রুইদাসকে চেনেন, তাঁরা তাঁকে নমস্কার করে অন্য পথে চলে যান।

রুইদাস বুকের ভিতর শালগ্রাম শিলা জড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। এ সম্পত্তি ক'জনার আছে? রুইদাস তাঁর জীর্ণ কাপড় দিয়ে ভাল করে ঢাকেন। কি জানি যদি রোদ্দুর লাগে। রোদের তাপ লাগলে যে কষ্ট হবে। পথ যেন আর ফুরোয় না—চলেছেন তো

চলেইছেন—এ পথ থেকে ও পথ। ও পথ থেকে সে পথ।

অবশেষে রাজবাড়ীতে এসে পৌঁছালেন।

রাজা রাজসভা অলঙ্কৃত করে বসে আছেন।

রুইদাসকে দেখতে পেয়ে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলে উঠলেন—মহারাজ ঐ সে চামার যে আপনার রাজ্যে বসে দিনের পর দিন অনাচার করে চলেছে। ওকে চরম শাস্তি দিন যাতে আর ভগবানের নাম মুখে না আনতে পারে।

রুইদাস হাসছেন—ভগবানের নাম ভুলিয়ে দিতে পারে এমন শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কে? মুক হয়েও ভগবানকে ডাকা যায়। যে নামের মধু একবার পান করেছে সে কোনদিনই ভগবানের নাম ভুলতে পারে না!

যবন হরিদাসকে বাইশবাজারে বেত্রাঘাতে সারা দেহ জর্জরিত করে দেওয়া হয়েছিল তবুও তিনি বলেছিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হয় যদি এই দেহ প্রাণ
তবুও না ছাড়িব আমি মধুর হরিনাম"

প্রহ্লাদের ওপর কি অমানুষিক নির্য্যাতন চালিয়েছিল হিরণ্যকশিপু। তবুও কি প্রহ্লাদ নাম ছেড়েছিল?

ছাড়েনি, কেউ ছাড়াতেও পারে নি। ভগবানকে যে আশ্রয় করে আছে তাকে আশ্রয়চ্যুত করে এমন শক্তি জগতে নেই। পাহাড় থেকে ফেলে দিলেও সে বেঁচে ওঠে, বিষকে সে অমৃতের মত পান করে, হাতীর পায়ের তলায় ফেললে হাতী তাকে মাথায় তুলে রাখে।

রুইদাস তাই হাসছেন।

মনে তাঁর এতটুকু আশঙ্কা নেই। সে নির্বিকার নির্ভয়।

রাজা রুইদাসের দিকে চেয়ে বললেন—রুইদাস এঁরা যা অভিযোগ করছেন তা কি সত্য?

—হ্যাঁ মহারাজ সবই সত্য। মন্দিরে আমার রঘুনাথ আছেন।

শালগ্রাম শিলা আছেন। ভোগারতি হয়। প্রসাদ সবাই পেয়ে থাকেন। সেই প্রসাদ খেয়ে কার কার জাত গেছে আমার জানা নেই।

রাজা ক্রোধে ফেটে পড়লেন—বাচালতা রাখ। তুমি চামার তোমাকে এসব অনাচার করতে কে বলেছে?

রুইদাস হাতজোড় করে বললেন, পূজার্চনা যদি অনাচার হয় তাহলে চুরি ডাকাতি, লোক ঠকানো, মিথ্যা কথা বলা কি আচারের মধ্যে পড়ে?

—চুপ কর ছোটলোক! শালগ্রাম শিলা এনেছ?

—হ্যাঁ প্রভু এনেছি।

—রাখ আমার সামনে।

রুইদাস রাজার সামনে একটা পদ্মপত্রে শালগ্রাম শিলা রেখে দূরে দাঁড়ালেন।

পরে রাজবাড়ীর পুরোহিতকে বললেন, আপনি শালগ্রাম শিলা নিয়ে গিয়ে রাজবাড়ীর মন্দিরে রাখুন, তারপর দেখছি এই চামারকে কি শাস্তি দেওয়া যায়।

রুইদাস মাথা নীচু করে বললেন, মহারাজ শাস্তিই আমাকে দিন। আপনার গারদে আমাকে আটকে রাখুন। বড় শান্তি পাব। দিনরাত ঠাকুরকে ডাকতে পারব। চামড়ার ঝোলা কাঁধে করে রোজ তাহলে আমাকে আর ছাতিম তলায় বসতে হবে না। সংসারের কথা ভাবতে হবে না। দিনরাত শুধু 'জয় রাম জয় রাম' করতে পারব। আপনি আমাকে ঐ শাস্তিই দিন মহারাজা।

পুরোহিত এসে শালগ্রাম শিলা আর তুলতে পারছেন না।

একি এত ভারী! মনে হ'চ্ছে যেন বিরাট এক মহীরূপ মাটির ভিতরে অজস্র শিকড় ছড়িয়ে বসে আছে।

রাজা বললেন, কি হ'ল পুরুতমশায়? শালগ্রাম শিলা নিয়ে যান।

—নিয়ে তো যাব কিন্তু ওঠাতে পারছিনা যে—

—সে কি কথা। রাজা নেমে এলেন শালগ্রাম শিলার কাছে। বার বার চেষ্টা করেও এক চুলও নড়াতে পারলেন না।

রুইদাস কাঁদছেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছে।

রাজা রুইদাসের কাছে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন—সার্থক তোমার সাধনা রুইদাস, ধন্য তুমি, ধন্য আমি। শালগ্রাম শিলা রাজবাড়ীতে মানায় না আর উনি এখানে থাকবেনও না। তুমি নিয়ে যাও। এঁর সেবাপূজা করার সামর্থ্য আমার নেই।

পরে ব্রাহ্মণদের বললেন, আপনারা রুইদাসের কাজে বাধা দেবেন না। ঈর্ষাও করবেন না। রুইদাস সাধারণ মানুষ নয়, চামারের ছদ্মবেশে কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা।

রুইদাস শালগ্রাম শিলা আবার বুকে করে নিয়ে এসে মন্দিরে রাখলেন।

এ সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

দেশ-বিদেশের মানুষ এসে ভীড় করে রুইদাসের হরিমন্দিরে। চিতোর থেকে এলেন রাজমহিষী ঝালী। তিনি এসে রুইদাসের কাছে দীক্ষা ভিক্ষা করলেন।

রাণী ঝালী রুইদাসকে করজোড়ে বললেন কৃপা করুন আমাকে দীক্ষা দিন, আমাকে পথ দেখান। মনে বড় ময়লা জমেছে। ধুয়ে মুছে যাতে পরিষ্কার করতে পারি সেই পথ বলে দিন।

রুইদাস বিস্মিত হয়ে বললেন—এ কি কথা বলছেন রাণীমা আমি মূর্খ, লেখাপড়া জানি না, কোন শাস্ত্রজ্ঞান আমার নেই সবার ওপর আমি চামার, আমি কি করে দীক্ষা দান করব

ভগবানের একটু কৃপা পাবার জন্য আমি কেঁদে বেড়াচ্ছি। আমি আপনাকে দীক্ষা দেব কি করে?

—তা হোক বাবা! আপনি আমার গুরু—আপনার কাছে দীক্ষা নিলে যদি জাত যায় যাবে কিন্তু প্রাণে আমি বাঁচব। আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না।

—প্রজারা অসন্তুষ্ট হবে। রাজ্যের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা আপনার নাম আর মুখে আনবে না। আপনি ফিরে যান—সন্ধান করুন আপনার সদ্‌গুরু মিলে যাবে।

রাণী রুইদাসের পায়ের ওপর আছড়ে পড়লেন—দীক্ষা না নিয়ে আমি চিতোর ফিরে যাব না।

রুইদাস মনে মনে বলছেন—ঠাকুর, তুমি আমাকে এ কি বিপদে ফেললে!

রাণীকে রুইদাস দীক্ষা দিলেন।

এই সংবাদে চিতোরের ব্রাহ্মণগণ রাণীর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলেন। শেষে রাণী গুরুর শরণাপন্ন হলে রুইদাস বললেন—বিরুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণদের একদিন পরম পরিতুষ্টি সহকারে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। খাওয়া হ'য়ে গেলে প্রত্যেককে ষোল আনা ভোজন দক্ষিণা দেবেন।

—বেশ বাবা তাই হবে।

ঐ দিন আপনি যদি একটু পায়ের ধুলো দিতেন তাহলে আমি শান্তি পেতাম।

– না মা তাহালে আপনার সব আয়োজন ব্যর্থ হবে। কেউ সেবা করবেন না। আমি যে মুচি মা। আমার উপস্থিতিতে তাঁরা অবশ্যই রুষ্ট হবেন। তাঁরা পরিতুষ্ট হোন। আপনার শান্তি হোক এই আমি চাই।

রাণী চিতোরে ফিরে বেশ ধুম-ধাম করে ব্রাহ্মণ সেবার ব্যবস্থা করলেন।

ব্রাহ্মণরা পংক্তি ভোজনের সময়ে দেখেন যে তুইজন ব্রাহ্মণের পাশে একজন করে রুইদাস বসে আছেন।

একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যেদিকে তাকান সেই দিকেই রুইদাস।

ব্রাহ্মণরা বুঝলেন সত্যিই রুইদাস সাধারণ মানুষ নন। মুচি হলেও রুইদাস অত্যন্ত শুচি।

লজ্জায় তাঁদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। পরে এই সব ব্রাহ্মণরা দলে দলে এসে রুইদাসের কাছে দীক্ষা নিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

এমন গুরু ক'জনার ভাগ্যে মেলে?

সত্যদ্রষ্টা যিনি, তিনিই গুরু। একালে গুরু গিরি ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। গুরু মন্ত্র দিয়েই কর্তব্য শেষ করে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে চলে যান।

ভগবানের দরজার দ্বারী হচ্ছেন গুরু।

গুরু যে পথ দেখাবেন শিষ্য সেই পথে চলবে।

আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করবে। কিন্তু তা হয় না—এইসব গুরুর শরণাপন্ন হয়ে মানুষকে ভিক্ষা করেও গুরুসেবা করতে হয়। শিষ্যরাও দীক্ষিত হয়ে কোন আচরণ করে না—কাজে কাজেই তাদের মানসিক সেবার কোন উন্নতি হয় না।

হে রঘুনাথ! তোমাকে ডাকতে পারলে সেই আমার মন্ত্রদীক্ষা হবে। সুখে-তুঃখে তোমাকে যদি স্মরণ করতে পারি সেই হবে আমার শুদ্ধাচারণ; শাস্ত্র ব'লে, পুঁথি ব'লে সবই তো তুমি। তোমাকে যদি জানতে পারি তাহলে আমার শাস্ত্রপাঠ হবে। তোমার কৃপায় অজ্ঞও বিজ্ঞ হয়। অজ্ঞানও জ্ঞানী হয়। আমি তোমাকে দেখতে চাই না, সে পাত্র আমি নয়। তুমি আমাকে দেখো—তোমাকে পাবো, এমন ভাগ্য আমার নেই, তুমি আমাকে গ্রহণ কর। সেই হবে আমার পরম লাভ।

রুইদাস আজন্ম তাপস। তাঁর সাধনা ক'জন জানে। এরই নাম জীবন সাধনা।

রুইদাসের সারা জীবনই সাধন-ভজনে পরিপূর্ণ।

সিদ্ধি বুদ্ধি সবই তাঁর করতলগত। তাই তিনি সিদ্ধপুরুষ তাই তিনি মহামানব। সর্বপূজ্য মহান সাধক।

ছাতিমতলায় বসে রুইদাস তেমনি ভাবে। আজকাল আর জুতো সেলাই করেন না। রঘুনাথ তাঁকে পাকা চাকরীতে নিয়োগ করেছেন।

দিনরাত তাঁর হরিমন্দিরেই কেটে যায়।

সব সময় তিনি নাম গান নিয়েই বিভোর।

সংসারের ভাবনা লছমী ভাবে।

একদিন লছমী অভিযোগের সুরে বলে—আচ্ছা! মন্দির করে যে তুমি সব ছেড়ে দিলে। আগে জুতো সেলাই করতে, হু'চারটে পয়সাও ঘরে আনতে এখন তো তাও বন্ধ।

রুইদাস জবাব দেন—তোমার যা চাই তুমি রঘুনাথকে বল, তিনি সব দেবেন—তাঁর অদেয় কিছুই নেই। তাঁর নির্দেশেই তো চলছি আমি। তিনি যদি আবার আদেশ দেন তাহলে আবার জুতো সেলাই করব!

একটু থেমে বলেন—লছমী! বড় ভাগ্যবান আমি। তাই রঘুনাথ আমাকে এই চাকরী দিয়েছেন। তোমার একটু কষ্ট হচ্ছে এই যা। লছমী তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, এসব কথা তুমি বোল না। আশীর্বাদ কর এমন কষ্ট যেন আমি জীবনভোর করতে পারি। একটু আগে আমি যা বলেছি তা অন্য কথা।

—কি কথা লছমী?

—তোমার একটা ভাল কাপড় নেই, একটা জামা নেই, দিনরাত কত মানুষ আসছে, তাদের সামনে তুমি ঐ বেশে থাক। আমার বড় কষ্ট হয়।

রুইদাস হাসলেন—লছমী, আমারও বড় কষ্ট হয়, এই ভাবে যে এই দুনিয়ায় আমার চেয়ে কত মানুষ আছে, যাদের কোন আভরণ নেই। একবেলা খেয়ে সারাদিন উপোস করে তাদের দিন কাটে। তাহলে আমি তো অনেক সুখী। আমার রঘুনাথ চৌদ্দ বছর বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছেন গাছের বাকল পরে, গাছের ফল খেয়ে, একথা তুমি জান?

—জানি!

—জীবনে সুখ, পরিধানে নয়, ভোজনেও নয়। সুখ আচরণে। সে আচরণ ধর্মাচরণ। ডাকতে ডাকতেই সময় কেটে যায়। আমার রঘুনাথ তো খাওয়া পরার কথা ভাবতেই দেন না। এ যে কি আনন্দ তা বলতে পারব না—এ আনন্দ যেন আমার কোনদিনই ফুরায় না।

লছমী অন্যকাজে চলে যেতে পা বাড়ায়।

রুইদাস বললেন, কোথায় চলেছ?

—যাই ঘরখানা পরিষ্কার করি—এখানে চামড়া, ওখানে ছেঁড়া জুতা, ওখানে ন্যাকড়া, ওখানে খালি কালির কৌটা—যত পরিষ্কার করতে চাই ততই আবর্জনা বাড়ে।

—হ্যাঁ তাই কর লছমী। আমাদের ঘর বাইরে শুধু আবর্জনা পরিষ্কার করতে করতে যেদিন আবর্জনা ফুরিয়ে যাবে সেদিন রঘুনাথ অবশ্যই কৃপা করবেন।

ঘরের আবর্জনা সাফ করলেই রঘুনাথ আসবেন?

—হ্যাঁ গো! ও ঘর নয়। তোমার মনের ঘর গো—দেখতে পাও না কত নোংরা জমে আছে? হিংসা, লোভ, কাম, ক্রোধ—এ ময়লা পরিষ্কার সোডা সাবানে হয় না। দু'চার দশ জনমেও পরিষ্কার হয় না। এ ময়লা পরিষ্কার করতে হ'লে ভক্তির প্রয়োজন। প্রেমের প্রয়োজন।

—এসব কোথায় পাব?

—সবই তাঁর নামে আছে। খুঁজে নাও ঠিক পাবে।

রুইদাস মন্দিরের পথে পা বাড়ান।

লছমী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলেন—ঠাকুর তুমি তো সবই জানো আমার আর কিছুই নেই—তোমাকে ছাড়া সে কাউকে জানে না, চেনেনা। কখনও কাঁদে কখনও হাসে। পুকুরের জলে গাছের ছায়া দেখে রঘুনাথ ভেবে ঝাঁপ দিতে যায় জলে। ও ভাবছে তোমার জন্য, আর আমি ভাবছি ওর জন্য।

আমিও ভাবি। তুমিও ভাব।

এই ভাবনার ফাৎনা জলে ডুবলেই তো টান মারতে হবে।

ভক্ত রুইদাস জীবন নদীর কূলে ভক্তির ছিপ ফেলে বসে আছেন। দৃষ্টি তাঁর ঐ ফাৎনার দিকে।

একালে আমরা দুঃখ কষ্ট পাব। শোকতাপে আঘাত পাব এ আর নতুন কথা কি!

বিশ্বাস নেই, প্রেম নেই, ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা নেই—নেই একাগ্রতা একনিষ্ঠতা। নেই ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা।

যিনি কৃপাময়—

তিনি দয়া করতে চাইলেও কোন্ পথে আসবেন। সব পথেই তো বাধা। সবাই অনিত্য বস্তু নিয়ে ঘর করছে। নিত্য বস্তুর সন্ধান কে করছে?

এ জগতে সত্য বস্তু কি?

যা কিছু দেখছি তার মধ্যে সত্য নেই। সবেই জলের দাগ—এই আছে এই নেই। এ পৃথিবীর সবাই পঞ্চভূতে সৃষ্টি। মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সবাই পেতেছি দু'দিনের সংসার। কে স্ত্রী, কে পুত্র, কে কন্যা সবই তো মায়াতে আসা যাওয়া করে।

একমাত্র ভগবান সবার মূল—এই মূলে আশ্রয় নিলে আর বার বার আসা যাওয়া করতে হবে না।

নিত্য সনাতন পরম দয়াল ভগবানের চিন্তা ছাড়া জন্ম-মৃত্যু-জরার

হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ নেই। এ ভববন্ধন থেকে মুক্ত পেতে হলে তাঁর দাস হতে হবে।

> "ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তি কভু নাহি হয়
> তিনি গতি তিনি মুক্তি তিনি বিশ্বময়।"

গুরু রামানন্দ স্বামী তীর্থের পর তীর্থ ঘুরতে ঘুরতে কাশীতে এসেছেন। তিনি একদিন রুইদাসের হরি মন্দিরে এসে পৌঁছালেন। রুইদাস তখন গঙ্গাস্নানে গেছেন। মন্দিরের অঙ্গন-প্রাঙ্গণ পরম ভক্তিভরে পরিষ্কার করছেন লছমী।

রামানন্দ স্বামী মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি দেখতে পেয়ে তিনি আপন মনে বলছেন—আজ ত্রিশবছর তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ আর সাথে সাথে আমাকেও ঘর থেকে বার করেছ। এই দীর্ঘদিনে কত চোখের জল পড়েছে তবুও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল না?

—কে আপনি প্রভু?

—আমি এক মহাপাপী।

—কি এমন মহাপাপ করেছেন?

—আমারই ভুলের জন্য এক জ্ঞানতাপস নদীর জলে আত্মবিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু মা সে তো আবার জন্মেছে। তবে কোথায় গেল সে—

—কি তার নাম?

—রামদাস! সে এক মুচির ঘরে জন্মেছে। ত্রিশ বছর পার হ'য়ে গেছে এখন তার বয়স ত্রিশের বেশী হবে। রামনামই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। রামনাম ছাড়া সে কিছু জানে না।

—আমার স্বামীর নাম তো রামদাস নয়।

—তবে কি নাম তার ?

তাইতো স্বামীর নাম মুখে আনি কি করে !

পাশে একজন বললে,—রুইদাস !

—না না, রামদাস তার নাম। রামচন্দ্রের দাস তার মত বোধহয় আর একটাও নেই। আমি জানি ভগবান রামচন্দ্র তাকে কৃপা করবেন—আর দেরী নেই। সময় এসে গেছে।

—আহা তাই যেন হয়। রাম ছাড়া যে সে কিছুই জানে না। সে যেন তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত না হয়।

এমন সময় রুইদাস হাতজোড় করে মন্দিরের দোরে এসে দাঁড়ালেন। মুখে তাঁর রাম নাম।

এখনও বলছেন, আর কবে দেখা দেবে রঘুনাথ। তোমাকে ছুঁলে যদি জাত যায় তবে ছোঁবনা। শুধু দূর থেকে দেখব। চোখে দেখা দাও ঠাকুর ! আর যে দেরী সয়না।

ব্রাহ্মণরা রাজার কাছে অভিযোগ করে সন্তুষ্ট না হয়ে বাদশার কাছে অভিযোগ করলেন যে এর বিহিত করা এখুনি দরকার।

এক বিরাট সভা সমাবেশ করা হল।

ব্রাহ্মণরা বললেন—পূজার্চনা করার অধিকার ঐ নীচুজাতি রুইদাসের নেই। সব জাতের মানুষকে রুইদাস তার পা ধোয়া জল খাওয়াচ্ছে। সকলকে সে ধর্মচ্যুত করছে।

সে সভায় রুইদাসও উপস্থিত ছিলেন। সেখানেও তাঁর ডাক পড়ল। বাদশা জিজ্ঞেস করলেন—আপনি দেবতার পূজা কেন করেন। এতে তো আপনার কোন অধিকার নেই !

রুইদাস মাথা নীচু করে জবাব দিলেন—দেবতাকে কে কিনতে পেরেছে, হুজুর ? সকলেরই তাঁকে ডাকবার, ভজনা ও আরাধনা

করবার অধিকার আছে। আমি তো অন্য কোন মন্দিরে অন্য কারও বিগ্রহের পূজা করিনি! আমার মন্দিরে আমার বিগ্রহ পুজো করি তাতে দোষ কোথায়?

বাদশা চিন্তিত হ'লেন—সত্যিই তো ভগবান কারও কেনা নয়। ভক্তি প্রেম দিয়ে যে তাঁকে বাঁধতে পারবে তিনি তারই। দেবতার কাছে কেউ ছোট বড় নয়। সারা জগৎ সংসার তো তাঁরই সৃষ্টি। কে মুচি, কে মেথর, কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র এ হিসাব তো তাঁর রাখবার কথা নয়। সবই তো তাঁর। তবে এর মীমাংসা কে করবে? দীন দুনিয়ার মালিক একমাত্র সেই ভগবানই এর মীমাংসা করতে পারেন। কিন্তু কি উপায়ে?

ব্রাহ্মণরা অধৈর্য্য হয়ে উঠলেন।

কেউ কেউ চীৎকার করে উঠলেন—দেশটা কি অনাচারে ভরে যাবে। যার যা খুশি তাই করবে। আর ক'দিন বাদে দেখব যে মেথর মুর্দাফরাশ কোন মণ্ডপে বসে ভাগবত পাঠ করছে।

রুইদাস বললেন—ভাগবত পাঠ করারও অধিকার মেথরের আছে।

—সে কি পণ্ডিত না বেদজ্ঞ যে ভাগবত পাঠ করে ব্যখ্যা করবে? একজন বললেন।

রুইদাস একটু জোরেই জবাব দিলেন—না বুঝেও যদি কেউ পাঠ করে তাতেও সে ভগবানের কৃপা লাভ করবে। ছোট ছোট ছেলেরা পুজো পুজো খেলা করে তাতেও লাভ আছে। আমাদের দেশে অনেক সাধুসন্ত ছোটবেলায় খেলতে খেলতেই ভগবানকে লাভ করেছেন। খেলুড়ে হলে হবে না খেলাও জানতে হবে।

বাদশা বিপদে পড়লেন—এর ফয়সালা যিনি করবেন তিনিই করবেন। এ আমার ক্ষমতার বাইরে।

তিনি বললেন—এক কাজ করলে এর মীমাংসা হয়।

—কি সেই কাজ বাদশা তাড়াতাড়ি বলুন।

বাদশা বললেন, যাঁরা অভিযোগ করতে এসেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বিপ্রকুলে জন্ম নিয়েছেন।

একজন বলে উঠলেন—হ্যাঁ, এর মধ্যে অনেক মহামহোপাধ্যায়. অনেক মহাপণ্ডিত, অনেক বেদান্তবাদীও আছেন।

—বেশ শুনুন! আগামী পূর্ণিমাতে সকালে আপনারা ও রুইদাস সবাই নদীর তীরে সমবেত হবেন। আমি ও আমার পারিষদবর্গ যাব। শুধু তাই নয়, আশ-পাশের গ্রামের লোক যত আছে সবাইকে ঢোলসহরতে জানিয়ে দেওয়া হবে উপস্থিত থাকতে। নদীর ধারে বসে ব্রাহ্মণরা আরাধনা করবেন, পূজার্চনা করবেন, রুইদাসও তাই করবেন। সবাই কিন্তু এপারে, আর ওপারে একটা সিংহাসনে বিগ্রহ থাকবে।

এপারে বসে এঁরা আরাধনা করবেন। যার আরাধনায় দেবতা সন্তুষ্ট হবেন তিনি এসে তাঁর বুকে আশ্রয় নেবেন। কারও আরাধনায় যদি তিনি সন্তুষ্ট না হন তাহলে বুঝতে হবে আপনারা দেবতার পূজা করেন না। পাথরের পূজা করেন।

ব্রাহ্মণরা আশ্বস্ত হলেন এবং যুগপৎ চিন্তিতও হলেন।

রুইদাস কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না।

রঘুনাথ যা করেন তাই হবে।

পূর্ণিমার দিন নদীর ধার দিয়ে মানুষের স্রোত বয়ে এল। ব্রাহ্মণরা একটা নির্দিষ্ট স্থানে হোম-যজ্ঞ শুরু করেছেন। কিছুদূরে রুইদাস বসে আছেন হাতজোড় করে। ফুল বিল্বপত্রের বদলে তার চোখে জলের ধারা। বাদশার ইচ্ছানুসারে শালগ্রাম শিলা শোভা-যাত্রাসহকারে নৌকায় করে নিয়ে গিয়ে ওপারে স্বর্ণ সিংহাসনে বসান

হল। কি অপরূপ দৃশ্য! দেবতা আছেন কিনা তা নির্ণয় হবে নদীর কূলে।

ভারতবর্ষ দেবদেবতার দেশ। এখানকার মাটি দেব-দেবতার লীলাক্ষেত্র।

শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেছে—দেবতা এসেছেন, লীলা করেছেন, মানুষকে কৃপা করেছেন।

এসেছেন লাখো লাখো সাধুসন্ত প্রেম ভক্তির পসরা নিয়ে। দর্শন করেছেন ঈশ্বরকে। কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছেন। আজও ভগবান বিভিন্ন বেশে রয়েছেন মন্দিরে; মসজিদে, গির্জায়, গুরুদ্বারে। —প্রেমভক্তির অভাবে তিনি প্রকট হতে পারছেন না। কিন্তু তাঁর আরাধনা চলেছে সর্বত্র।

আকাশে-বাতাসে অনলে-অনিলে, জলে-স্থলে যাঁর স্থিতি তাঁকে কেন পরীক্ষা দিতে হ'বে অহমিকায় ভরা, অবিশ্বাসে ভরা মানুষের কাছে ?

রুইদাস তাই কাঁদছেন! চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছে।

ব্রাহ্মণরা স্তোত্র পাঠ করেছেন অবিরাম। হোমাগ্নির শিখা উঠছে আকাশে। সবাই চেয়ে আছে ওপারের দিকে।

রুইদাস রঘুনাথকে মনে মনে জানাচ্ছেন—হে রঘুনাথ! আমার বুকে তোমাকে আসতে হবে না, তুমি ব্রাহ্মণদের বুকেই এসে দাঁড়াও। তুমি নেই একথা সবাই বলবে এ শুনতে আমি পারব না। তার আগেই আমাকে নদীগর্ভে আত্মবিসর্জন দিতে হবে। তুমি এস প্রভু! তুমি এদের জানাও যে তুমি আছো নইলে সূর্য্য চন্দ্র উঠতো না। তুমি আছ বলে তাই আমরাও আছি।

বেলা বাড়ে। রোদের ঝিলিমিলি নদীর বুকে; মনে হল যেন সূর্য্যদেব পথ তৈরী করে দিলেন নদীর বুকে।

ওপারে সিংহাসন যেন নড়ে ওঠে। নারায়ণশিলা কখন যে

নদীর বুকে এসেছেন কেউ জানে না। জলে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে কিনারার দিকে।

রুইদাস কেঁদে বলছেন— এস প্রভু! তুমি না দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলে, তুমি না মা সীতাকে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছিলে। আজও আবার এস প্রভু!

নারায়ণ শিলা এসে রুইদাসের বুকে আশ্রয় নিল।

অবাক বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখে সবাই ধন্য ধন্য করে উঠল।

ব্রাহ্মণরা যাঁরা হোম যজ্ঞে বসেছিলেন তাঁরা সবাই চলে গেলেন।

তারপরের দৃশ্য আরও অপূর্ব!

দলে দলে লোক এসে রুইদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কে ক্ষত্রিয়, কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র সব একাকার হয়ে গেল। দেব-দেবতার মহিমা কোনদিন ম্লান হয়নি আজও হবে না। দেবতা আছেন তাই জীবজগত আছে।

মানুষে মানুষে যত অমিল হবে, ততই ঈশ্বরের অস্তিত্ব লোপ পাবে। মানুষের হৃদয়মন্দিরই তো দেবতার আবাসভূমি। সেখানে হিংসা, দ্বেষ থাকলে দেব-দেবতা থাকবেন না।

রুইদাস যত দিন যায় ততই ঘর সংসার যেন ছেড়ে দেন। মন্দিরই তাঁর ঘরবাড়ী!

লছমী মাঝে মাঝে বলে সব কি ছেড়ে দিলে?

—সব মানে?

—'সংসার ধর্ম, আমাকে, সবই তো তুমি ভুলে যাচ্ছ!

—না লছমী, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। আমরা বড় আশ্রয়ে আছি। ঘর বাড়ী আর ভাল লাগে না। সব সময় মনে হয় কে যেন ডাকছে। যেন বলছে ওরে, ধূলো বালি তো অনেক

মাখলি এবার ঘরের ছেলে ঘরে আয়।

—ওমা সে কি কথা, তুমি তো ঘরেই আছ। আবার কোন্ ঘরে যাবে ?

—না লছমী, এ ঘর তো আমাদের নয়। এ সবআমরা ভাড়া নিয়েছি। আমাদের ঘর হচ্ছে রঘুনাথের চরণ।

লছমী একথা শুনে বিমর্ষ হয়ে যায়।

—আমি কোথায় যাব ?

—রঘুনাথকে ডাক তিনিই ব্যবস্থা করবেন। তোমার চিন্তা যিনি করবার তিনি করছেন।

রুইদাস 'জয় রাম জয় রাম' বলে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

কখনও কাঁদছেন কখনও হাসছেন। কখনও বলছেন আর কবে দেখা দেবে। সময় কি এখনও হল না। এত ডাকছি এত কাঁদছি তবুও কি তোমার দয়া হচ্ছে না !

এমন সময় একজন শিষ্য এসে রুইদাসকে ডাক দেয়—গুরুদেব !

—কে রঘুনাথ এলে নাকি। এতদিনে দয়া হল। দাও তোমার পা দুটো আমার মাথায় দাও।

—গুরুদেব আমি !

—হ্যাঁ তুমিই আমার রঘুনাথ।

লছমী রুইদাসকে ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলেন—একি তুমি পাগল হলে নাকি ? ও তো শ্যামলাল।

—তা হ'বে ! কি জানি আমার কি মনে হল।

একটু থেমে বলেন—লছমী একটু আগে কি যেন তুমি বললে আমি পাগল হলাম নাকি ? রঘুনাথের জন্য পাগল হতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করতাম। কই আর তা হলাম।

এ দুনিয়ায় আসল পাগল মেলা ভার। নকল পাগলের মাতামাতি। মনের আগল না খুলে গেলে পাগল হওয়া যায় না।

রুইদাস আসল পাগলই হয়েছেন

নকল জিনিসে অশুচি আসলেই আসলের সন্ধান পাওয়া যায়। নকল নাড়াচাড়া করে আমরা দিনের পর দিন বিকল হয়ে চলেছি।

কেবল ফাঁক আর ফাঁকি—

• এই নিয়েই পেতেছি আমরা সংসার।

সন্ধ্যা হওয়ার আর দেরী নেই। জীবন আমাদের কালো অন্ধকারে ঢেকে আছে। অতীতের পতিত জমিতে ফসল ফলল না। বর্তমানেও সে জমিতে খরা। ভবিষ্যতেও সে জমিতে হ'বে অতি বর্ষণ।

ফসল আর ঘরে তোলা হল না।

এই দেহজমি অনাবাদী থেকে গেল। এতে আর ফসল ফলল না।

তবে কি হবে!

কি হবে—

আবার আসতে হবে, আবার নকল আর মেকী জিনিষ নিয়ে সংসার পাততে হবে, হাসতে হবে, কাঁদতে হবে।

এই ভাবেই আসতে হবে যেতে হবে।

একবার আসা একবার যাওয়া।

আবার আসা, আবার যাওয়া।

নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধনে রুইদাসের শরীর যেন দিন দিন ভেঙে পড়ে। পেটে ক্ষিধে নেই। একই চিন্তা তাঁর সারা দেহমনে ঘুরে বেড়ায়।

লছমী চিন্তিত হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে বলে—তোমার শরীরের যা অবস্থা হচ্ছে তাতে আমার ভয়ানক চিন্তা হয়েছে। এমন ভাবে চললে তুমি আর ক'দিন বাঁচবে?

রুইদাস জবাব দেন—এই ত্রিভূবনে আমার প্রভু হচ্ছেন রঘুনাথ। তাঁর ইচ্ছাতেই মরণ বাঁচন। আমাদের কি শক্তি আছে? যে ক'দিন তিনি রাখবেন সে ক'দিনই আমাকে থাকতে হবে। মানব-জনম পেয়ে এমন সুযোগ হেলায় হারালে তো চলবে না। ডাক, ডাক, প্রাণ ভরে ডাক—এমন সুযোগ আর জীবনে নাও আসতে পারে।

লছমীর মুখে বিষাদের ছায়া—

একটু চুপ করে থেকে বলে—রঘুনাথ, রঘুনাথ করে কি পেলে বলতে পার ?

—সবই পেয়েছি লছমী। তিনি আমার কোন অভাবই তো রাখেন নি। তিনি আমাকে যা দিয়েছিলেন তাতে আমি রাজার হালে থাকতে পারতাম, কিন্তু আমি তো তা চাইনি। যা আমি চাই তাই পেলে আমি বুঝব আমার মানবজনম সার্থক হল। তবে তোমার জীবন ভোর কষ্টেই দিন কাটল। জীবনটাকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে তোমার দুঃখের শেষ থাকল না। লছমী ! তবুও আমি বলছি তুমি রাজরাণীর চাইতেও সুখী। রঘুনাথ তোমার কথাও ভাবছেন। তোমাকেও তিনি ভুলে নেই।

লছমী চোখ দুটো বড় করে রুইদাসের দিকে তাকাল।

রুইদাস বললেন - হ্যাঁ লছমী ! এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যা নেই। একমন হয়ে ডাকাডাকি করলে তিনি কি আর ফাঁকি দিতে পারেন ? তিনি যে ভালবাসা পাবার কাঙাল। দেবারও কাঙাল। দিতে যে জানে পেতেও সে জানে।

পয়সা দিয়ে যা সওদা করা যায় না রুইদাস ভক্তি দিয়ে তা সওদা করেছে।

তাই ছাতিমতলার সেই মুচি রুইদাস আজ মানুষের কাছে ভক্ত রুইদাস। জুতো সেলাই করে যার একদিন দিন কেটেছে আজ সে তার ছেঁড়া ফাটা জীবনকে প্রেমভক্তির সূতো দিয়ে সারাই করে নতুন জীবন লাভ করেছে।

রুইদাস আজ ভগবানের দাস হয়েছেন।

দাস হতে গেলে ভগবানের আবাশে বাসা নিতে হবে। সে বাসা নিতে হলে সেলামী দিতে হবে।

সেলামী কি ?

অন্তরের যে শুদ্ধভক্তি তাই সেলামী দিতে হবে।

ক'জন পারে তা দিতে ? ক'জন চেষ্টা করে সেই সেলামী দিতে ?

মন্দিরের আঙিনায় বসে আপন মনে রুইদাস কীর্তন করছেন। গানের সুরে সারা মন্দিরে এক অপরূপ ভাবের মূর্চ্ছনা ছড়িয়ে পড়ছে।

তোমার নাম করব। তোমার ভাবে পাগল হব।

এই জন্যই তো দুনিয়ায় এলাম। তোমার কৃপা পাব বলেই তো আমার হাসা-কাঁদা।

তুমি ছাড়া আর কাকে ডাকব? তুমি ছাড়া আর কার জন্য কাঁদব?

ধীরে ধীরে দু'চারটে লোক এসে মন্দিরে রুইদাসের পাশে বসে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মেলায়।

রঘুনাথ কান পেতে শুনছেন—

এমন হৃদয় গলানোর সুর কে না শুনবে?

গান শেষে রুইদাস 'রঘুনাথ' বলে কেঁদে ওঠেন।

রঘুনাথ বুঝি পাশের বাড়ীর লোক, ডাক দিলেই চলে আসবেন?

না ডাকলে কেউ কি আসে?

আসে না। দরকার যার আছে সেই ডাকবে।

তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার। তাঁকে না হলে আমার চলবে না এই ভাব নিয়ে যে ডাকবে তিনি অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দেবেন। বাড়ীতে থাকলে সাড়া না দিয়ে কি থাকতে পারবেন? বার বার ডাকতে তিনি বিরক্ত হয়েও সামনে আসবেন।

তাঁর বাড়ী আমার বাড়ী তো এক।

একই বাড়ীর বাসিন্দা হতে পারলে আর ভাবনা কি—দরকার পড়লেই ডাকো, চলে আসবেন।

দরকারটা কি!

তাঁর অপার করুণা ভিক্ষা?

বড় দরকার ওটা। না হলে আমার চলবে না।

এই ভাবের অভাব যার নেই সে অবশ্যই পাবে তার আরাধ্য দেবতাকে।

মন্দিরের ভিতরে রঘুনাথজী বসে বসে দেখছেন সব কিছু। এ জগতে সংসারের সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে।

হে দীনদয়াল! মানুষের মনে মনে তুমি বাসা বাঁধো। তাদের তুমি একলা ঘরে রেখো না। তোমার মায়ার তাড়নে তারা বড় উত্যক্ত। তুমি তাদের শান্তিতে রাখ।

তোমাকে ভুলেই আজ যে অশান্তি ভোগ করছে তার নিরসন কর।

তাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলে দিয়ে তোমার করে নাও। তারা তো তুমি ছাড়া নয়। তাদেরও তুমি ছাড়া কর না।

রামানন্দ স্বামী তীর্থের পর তীর্থ ঘুরে বেড়াচ্ছেন অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে। কখনও দ্বারকা, কখনও হরিদ্বার, কখনও বৃন্দাবন। তাঁর প্রিয় শিষ্য রামদাস কোথায় কোন মুচির ঘরে জন্ম নিয়েছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না। অনেকদিন আগে কাশীতে একজনার সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর উপস্থিতিতে শিশু দুধ পান করেছিল কিন্তু তারপর আর কোন সন্ধান পায়নি।

ভূলের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে যে করতেই হবে।

আবার তিনি কাশী এলেন।

মহল্লায় মহল্লায় ঘুরছেন। পথে কোন মুচি দেখলেই থামছেন, তার মুখের দিকে চেয়ে থাকছেন কিন্তু মিলছে না।

অবশেষে সন্ধান পেলেন যে এক মুচি মন্দির তৈরি করে তার অধ্যক্ষ হয়ে দেবসেবা করছেন।

রামানন্দ স্বামী ঘুরতে ঘুরতে গেলেন সেই মন্দিরে।

রুইদাস কয়েকজন শিষ্য নিয়ে ধর্মালোচনায় রত।

রামানন্দ স্বামী দাঁড়ালেন মন্দির প্রাঙ্গণে।

অরা এসে রামানন্দর দেহে আশ্রয় নিয়েছে—নানা রকম ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত।

রুইদাস তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে বসালেন মন্দিরের বারান্দায়।

দুজনা দুজনার দিকে তাকালেন।

রামানন্দ স্বামী বললেন—আমি যাকে চাই তাকে পাই কোথায়? আমি আমার শিষ্য রামদাসকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

—কেন সে আপনার কি করেছে?

—সে এক মহা অন্যায় করেছিল যার জন্য তাকে আমি অভিশাপ দিয়েছিলাম যে সে মুচির ঘরে জন্মাবে। সে মুচির ঘরেই জন্ম নিয়েছে এও বোলেছিলাম যে মুষ্টি ভিক্ষা একই জায়গায় নেওয়ার অপরাধে ত্রিশ বছর বাদে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাবে। ত্রিশ বছর বোধহয় কয়েকদিন হল পার হয়ে গেছে তার যে কি হল তাই ভাবছি।

—কিন্তু আপনি যাকে খুঁজছেন সে তো রামদাস আর আমি তো রুইদাস।

একটু থেমে রুইদাস বললেন—বর্তমানে আপনার দৈনন্দিন জীবন যাত্রা কি ধরনের।

—অহিতকর্মে আমার দিন কাটছে।

—অহিতকর্ম সে আবার কি? আপনাকে দেখলে মনে হয় শুদ্ধাচারী তাপস। আপনার পক্ষে কোন অহিতকর্ম করা সম্ভব নয়।

রামানন্দ স্বামী একটু হাসলেন।

রামানন্দ স্বামী হাসি থামিয়ে বললেন অহিত কর্ম বলতে শুধু চুরি ডাকাতি করা বোঝায় না। মানুষ হয়ে জন্মে ভগবানকে ভুলে থাকার মত অহিত কর্ম আর নেই। যাঁর কৃপায় পৃথিবীর আলো দেখলাম, পিতামাতা পেলাম, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-

স্বজন পেলাম তাঁর জন্য ভাবলাম না, কাঁদলাম না তাহালে অহিত কর্ম করলাম কিনা তাই বল !

রুইদাস কাঁদছেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছে।

সত্যই তো রঘুনাথজী তো এখনও তাঁকে কৃপা করলেন না। সংসার সংসার খেলা করে জীবন শেষ হয়ে গেল। কৃপা কর প্রভু আর যে ধৈর্য্য মানে না।

"ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জয়ন্তী
রোগাশ্চ সএব-ইব প্রহরন্তি দেহম্
আয়ু পরিশ্রবতী ভিন্নঘটা দিবান্তো
লোকস্তথাপংহিতমা চরতীতি চিত্রম্"

—বৈরাগ্যশতক

ভয়াল, ভয়ঙ্কর, তর্জনগর্জনরতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় জরা এসে দেহে আশ্রয় নিয়েছে—তার সাথে এসেছে নানারকম ব্যাধি। তারা দিবারাত্র দেহকে ঠুকরে ঠুকরে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। ভাঙা ঘটের জলের মত জীবন থেকে আয়ু ক্ষয়ে যাচ্ছে পলে পলে। কিন্তু কি বিচিত্র ! মানুষ তথাপিও আপন আপন দুষ্কর্ম করেই চলেছে।

এই আমাদের অমূল্য জীবনের কলঙ্কময় চরিত্র—এই আমাদের মানবজনমের মৃত্যুর আভরণ।

অহন্যহপি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্
শেষা স্থাবরমিচ্ছন্তি বিস্ময়শ্চর্য্যমতঃ পরম।"

—মহাভারত বনপর্ব

প্রতিদিন জাতপদার্থ মরছে। এ দেখেও জীবিত যারা তারা ভাবছে তাঁরা মরবে না। চিরদিন বেঁচে থাকব, সুখ ভোগ করব. এর চাইতে আশ্চর্য্য আর কি হতে পারে ?

উপরোক্ত কথাগুলি বলেছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির।

বেঁচে থেকে আরও ভাল করে বাঁচতে গেলে ভগবানের কথা চিন্তা করতে হবে—প্রকৃত সুখ সেই পরম দয়াল ভগবানকে স্মরণ,

মনন, করতে হবে—ঐশ্বর্য্য, সুখ কোথায়? বিষয় আসয়ে সুখ কোথায়? ত্রিজগতের ঐশ্বর্য্য যাঁর মধ্যে সেই ঐশ্বর্য্যময় ভগবানই জীবের একমাত্র আশ্রয়। এ আশ্রয় যার নেই সেই নিরাশ্রয়।

রামানন্দ স্বামী রুইদাসের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

কি দেখছেন তিনি?

এমন নিষ্ঠা, এমন একাগ্রতা, এমন ভক্তি তিনি একজনের মধ্যেই দেখেছিলেন, তিনি রামদাস।

আজ আবার তাকে দেখতে পেলেন তিনি রুইদাসের মধ্যে!

রামানন্দ স্বামী বললেন—তোমার আশা পূর্ণ হবে!

রুইদাস নীচু হয়ে প্রণাম করতেই রামানন্দ স্বামী তার পিঠে খড়মের দাগ দেখে চমকে উঠলেন। একি তোমার পিঠে এ দাগ কিসের?

রুইদাস বললেন—পদাঘাতের দাগ, গুরুর কাছে অপরাধ করেছিলাম তাই এই শাস্তি—

রামানন্দ স্বামী রুইদাসকে জড়িয়ে ধরে বললেন—ওরে আমি সেই মহাপাতক রামানন্দ স্বামী। তুই আমার সেই রামদাস, আজ আমার কাজ শেষ হল। যা খুঁজছিলাম তা পেলাম।

রুইদাস হাতজোড় করে বললেন—প্রভু রঘুনাথকে কবে পাব?

—ত্রিশবছর পার হয়ে গেছে এবার তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ অবশ্যই হবে।

—হবে, হবে? আমার আশা পূর্ণ হবে?

রামানন্দ স্বামী বার বার রুইদাসকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

রুইদাস মন্দিরের সামনে বসে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। এ চোখের জল একদিনের নয়, দুদিনের নয়। এ চোখের জল জমেছে বহুকাল ধরে। বরফের মত জমা ছিল চোখের কিনারে। আজ বুঝি রঘুনাথ রুইদাসের চোখের কিনারা দিয়ে পা ফেলে চলেছেন তাই চোখের জল পড়ছে। ধন্য রুইদাস তোমার সাধনা—

"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি রাম ভজে।
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি রাম ত্যজে।।"

এ কথার প্রমাণ তুমি।

মন্দিরের সিংহাসনে রঘুনাথ হাসছেন। রুইদাস কাঁদছেন।

একজন হাত বাড়িয়ে আছেন আর একজন এগিয়ে চলেছেন। ভক্ত আর ভগবানের মিলন লগ্ন বুঝি সমাগত। এমন লগ্ন কজনার জীবনে আসে?

রুইদাস বালকের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

লছমী কোন ফাঁকে এসে রুইদাসের পাশে বসেছেন তা কে জানে।

রুইদাস চোখটা মুছে বললেন—লছমী তুমি বল আর কবে আমি রঘুনাথের দর্শন পাব। পথ তো শেষ হয়ে গেল।

লছমী চোখ দুটো বড় বড় করে তাকালেন রুইদাসের দিকে।

রুইদাস কোন জবাব না দিয়ে সুর ধরলেন—

"ভজরে ভাইয়া রাম গোবিন্দ হরি
রামগোবিন্দ হরি
জপ তপ সাধন কচ্ছু নাহি লাগত
খরচ তো নাহি গধরী।
সন্তত সম্পত সুখকে কারণ
জাশো ভুলপরী।
কহত কবীরা রাম ন জামুক
তা মুখ ধুলভরী।"

আবার সেই চোখে জলের স্রোত।

কাঁদ রুইদাস আরও কাঁদ—কাঁদতে কাঁদতে চোখ অন্ধ করে ফেল! তারপর ভিতরে চেয়ে দেখ পাও না কি।

রুইদাস বললেন—লছমী, এ জনমে জানলাম না কেমন করে তাঁকে ডাকতে হয়। বুঝলাম না কেমন করে বুঝতে হয়। ভাবতেও পারলাম না কেমন করে তাঁকে ভাবতে হয়।

লছমী বলে—তোমার কথা সব তো আমি বুঝিনা—তোমার রঘুনাথ তোমাকে নিয়ে লুকোচুরি খেলছেন।

—হয় তো তাই হবে। তা না হলে ধরা দিতেন। কিন্তু লছমী! তাঁকে ধরতে গেলে যে বস্তুর দরকার তা তো আমার নেই। তাই আমি পেলাম না—আমি পেলাম না।

রুইদাস আর কোন কথা বলেন না। চক্ষু মুদ্রিত করে বসে থাকেন।

—চল দুটো মুখে কিছু দেবে। না খেয়ে খেয়ে তুমি যে হাড়সার হয়ে গেলে। এমনি ভাবে চললে আর ক'দিন তুমি বাঁচবে?

—আর বাঁচার সখ নেই। বেঁচে থেকে যে সুখ তা তো দীর্ঘ দিন ধরে অনুভব করলাম। দুঃখের নদীর কিনারে আমি নৌকা বেঁধেছি, সুখের ঢেউ কোথা থেকে লাগবে? এবার ছুটি চাই।

—বাঃ বেশ কথা বলছ, আমার কি হবে?

রুইদাস হাত দিয়ে দেখালেন রঘুনাথজীর মূর্তির দিকে—উনি দেখবেন, ভরসা রাখ।

লছমী অন্যত্র চলে যায়।

। চার ।

পূণ্যভূমি ভারতবর্ষে যুগে যুগে কালে কালে সাধক এসেছেন, সাধিকা এসেছেন, মহাপুরুষ এসেছেন। মানুষের বেশে মানুষের মাঝে বসবাস করে সবাই সেই একই কথা বলে গেছেন।

ভরসা রাখ।

বিশ্বাস রাখ।

তিনি আছেন।

ডাক পাবে।

যেভাবে পার ডাক, কাঁদ তাঁর জন্য।

তিনিও কাঁদবেন!

কিন্তু কলির জীব দিনের পর দিন ঘর বাঁধছে মায়ার বেড়া দিয়ে। সংসার সাজাচ্ছে পুত্র কন্যার পুতুল দিয়ে। শোকে তাপে জ্বলে জ্বলে খেলা শেষে চলে যাচ্ছে। সময় তাদের মিলছে কই?

সেই পরম করুণাময় ভগবান নিকট আত্মীয়ের মত সব সময় তাদের ডাকছেন।—ওরে মিথ্যা খেলা শেষ করে দিয়ে এবার আসল খেলা খেলবি আয়।

ক'জন সে ডাকে এগিয়ে যাচ্ছে?

যাচ্ছে না।

জনমে জনমে মরবার জন্য যাদের জনম তাদের ধরম করম কোথা থেকে হবে।

সাধক রুইদাসের জীবন অনুশীলনে ভরা। আজন্ম তিনি একই অনুশীলন করছেন। সে অনুশীলন ঈশ্বরের কৃপা লাভ।

তিনি নীচুজাতির ঘরে জন্ম নিয়েছেন। লেখাপড়ার ধার দিয়েও

যান নি। শাস্ত্র পাঠও করেন নি। কিন্তু একাগ্রতা, অটল বিশ্বাস, অচলা ভক্তি তাঁকে সর্ববিদ্যাবিশারদ করে তুলেছে।

ঈশ্বর আছেন এই বোধ যাঁর আছে তিনিই তো জ্ঞানী।

রুইদাসের সারা জীবনই এই বোধে ভরা। তাই পরশমণি তিনি লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর দেওয়া বনফুল মা গঙ্গা দু'হাত বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। তাই শালগ্রাম শিলা পর্বত প্রমাণ ভারী হয়েছিল। তাই নারায়ণ শিলা জলে ভেসে তাঁর কাছেই এসেছিল।

এ কৃপা ক'জনের ভাগ্যে মেলে ?

রুইদাসের জীবনব্যাপী সাধনার এই তো পরম সিদ্ধি। তাঁর সাধনা কোনদিনই ব্যর্থ হয়নি।

রুইদাস দিন দিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলেন।

মন্দিরেই তাঁর সবকিছু। কোথাও তিনি যান না। দিনরাত তাঁর মন্দিরেই কাটে

বড় গাছের তলায় তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। এর মত নিরাপদ আশ্রয় আর কি কোথাও আছে ?

যত দিন যায় ততই রুইদাস কেমন যেন হয়ে যান। তাঁর মুখের কথা শোনা যায় না।

তারপর একদিন—

সেদিন কোন মাস, কোন তিথি তা জানা যায় না। মন্দিরের ভিতর একপাশে তাঁর জীবন দীপ নিভে যায়। ভোরবেলায় যিনি মন্দিরের দোর খোলেন, তিনি দেখেন রুইদাস হাত জোড় করে বসে আছেন। চক্ষু দুটি মুদ্রিত। দেহ নিষ্প্রান।

ষোল শতকের প্রারম্ভে কি মধ্যভাগে ভারতবর্ষের এক মহান সাধক রুইদাসের জীবনতরী রামচন্দ্র সরোবরে নোঙর করল।

'জয় রাম জয় রাম' ধ্বনিতে সারা মন্দির মুখরিত।

রুইদাস নোঙর ফেলে বসে আছেন।

ঘরে যাব, ঘরে যাব বলে যাঁর চোখের জলে বুক ভেসে গেছে আজ তিনি সত্য সত্যই ঘরে গিয়ে উঠলেন।

এ ঘর তাঁর আপন ঘর। তাঁর শুদ্ধ জীবনের সিদ্ধপীঠ।

-ঃ সমাপ্ত ঃ—